বাংলাদেশের ইতিহাসে

ঘটনাবহুল ৭৫ সাল

আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব

অধ্যাপক গোলাম আযম

বাংলাদেশের ইতিহাসে

ঘটনাবহুল ৭৫ সাল

আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইতিহাসে

ঘটনাবহুল ৭৫ সাল

আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লব

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
আজাদ সেন্টার (৯ম তলা), ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০।
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
ফোন ৭১২৪১০৯, ৭১১২২০৪, ০১৭১১৫২৯২৬৬

© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪
চতুর্থ মুদ্রণ : মে ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
ISBN 984-8285-35-1

www.pathagar.com

এ পুস্তকের গুরুত্ব

"জীবনে যা দেখলাম" শিরোনামে আমার আত্মজীবনীমূলক লেখার চতুর্থ খণ্ডে ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত বিবরণ রয়েছে। এর মধ্যে "ঘটনা বহুল '৭৫ সাল শিরোনামে" ১৯৭৫ সালের আলোচনাই প্রায় অর্ধেক। এতে ১৫ আগস্টের সেনাবিপ্লব ও ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিবের কুশাসন, স্বৈরাচার ও এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি থেকে ঐসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ঃ

১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ।

২. রাজনীতির তিনকাল ঃ সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও এরশাদ আমলের প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী।

৩. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ ঃ প্রখ্যাত ভাষাসৈনিক, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি জনাব অলি আহাদ।

৪. একশ' বছরের রাজনীতি ঃ দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক ও রাজনৈতিক গবেষক জনাব আবুল আসাদ।

৫. যা দেখেছি, যা বুঝেছি ও যা করেছি ঃ আগস্ট-বিপ্লবের নেতা মেজর (অব.) ডালিম।

৬. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা ঃ লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামীদ।

৭. আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল ঃ অধুনালুপ্ত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত এডভোকেট এবং কুষ্টিয়া জেলার সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সা'দ আহমদ।

চতুর্থ খণ্ড বইটির এ অংশটুকুর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি বলে আলাদা বই হিসেবে তা প্রকাশ করা হলো, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ কম মূল্যে পেতে পারেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবের যতোই অবদান থাকুক, তাঁর ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের আদর্শ ও অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশের স্বাধীনতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। যারা বাংলাদেশকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান তারা শেখ মুজিবকে কিছুতেই আদর্শ নেতা হিসেবে মানতে পারেন না। যারা বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে আগ্রহী তারাতো ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদকে জঘন্য কুফরি মতবাদই মনে করেন। তদুপরি তারা জনগণের সহযোগিতায় দেশ গড়তে চান বলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিষ্ঠাবান সমর্থক। তাহলে গণতন্ত্রমনা ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের পক্ষে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে মান্য করা তো বহু দূরের কথা, কোন দিক দিয়েই তাকে আদর্শ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা করাও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

শেখ মুজিব শুধু আওয়ামী লীগেরই আদর্শ নেতা। আর শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্বই আওয়ামী লীগের একমাত্র মূলধন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কু-শাসনকালে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে শেখ মুজীবকে জাতির পিতা হিসেবে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ধ্বংস করাই তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের আজব রাজনীতি এ কথাও প্রমাণ করে যে, এ দেশে ইসলামী আদর্শের অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তারা ভারতের আধিপত্যও মেনে নিতে প্রস্তুত। ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ মতবাদ বাংলাদেশে চালু করতে হলে তাদের সহযোগিতা অবশ্যই অপরিহার্য।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে যারা ভারতের আধিপত্য থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী, যারা বহু-দলীয় ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চান এবং যারা আল্লাহর কুরআন, রসূলের সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট তাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে আওয়ামী লীগ কিছুতেই জনসমর্থন হাসিল করতে না পারে। আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হতে পারলে দেশের গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শ, এমনকি স্বাধীনতা বিপন্ন হবারও নিশ্চিত আশঙ্কা রয়েছে।

এ কারণে এ পুস্তকের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এতে পরিবেশিত মূল্যবান তথ্যাবলি ব্যাপকভাবে সর্বমহলে পৌঁছা খুবই জরুরী। যাতে জনগণ আওয়ামী লীগের খপ্পরে আর না পড়ে।

যে সাতটি গ্রন্থ থেকে আমি তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি তা যোগাড় করা ও অধ্যয়ন করা অনেকের পক্ষেই সহজ নয়। আমার এ সংকলনটি থেকে এতোগুলো গ্রন্থের মূল্যবান তথ্যসমূহ জানার সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করি।

গোলাম আযম
২৫ নভেম্বর ২০০৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ঘটনাবহুল '৭৫ সাল ১১
খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন ১১
বাদশাহ ফায়সালের শাহাদাতের দিন ১২
শেখ মুজিব হত্যা ১৪
লন্ডনে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া ১৫
আমি কীভাবে খবর পেলাম ১৫
১৬ আগস্টের পত্রিকা ১৬
মুজিব হত্যার পটভূমি ১৬
শেখ মুজিবের ব্যর্থতার কারণ ১৭
শেখ মুজিবের কুশাসন ২০
প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ মুজিব ২০
কল-কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ২১
যুব সমাজের অধঃপতন, দেশময় নৈরাজ্য ২১
আওয়ামী লীগের অবিবেচক রাজনৈতিক পদক্ষেপ ২৩
শেখ মুজিবের দাসখত ২৩
দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ২৪
কলঙ্কময় অধ্যায় ঃ ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠা ২৪
বাকশাল গঠন ২৫
আবুল মনসুর আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ২৭
নির্বাচনে আশা-প্রত্যাশা ২৮
হিসাবে ভুল ২৯
নির্বাচন ফল ও কুফল ৩০
আওয়ামী-নেতৃত্বের ভ্রান্তনীতি ৩১
জাতীয় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি ৩২
লেজের বিষ ৩৩
জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর রাজনীতির তিনকাল গ্রন্থ থেকে ৩৪
মাওলানা ভাসানীর মন্তব্য ৩৬
আর্মি অফিসারদের শেখ মুজিবের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি ৩৬
রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ৩৭
শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ ঃ দুঃখজনক পরিণতি ৩৭

www.pathagar.com

কুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ৩৮
স্বৈরশাসনের ভয়ানক পরিকল্পনা ৩৯
আওয়ামী লীগের তৈরি লোকদের চরিত্র ৪০
শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ৪১
১৫ আগস্ট ('৭৫) এবং ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ৪২
বিদেশীদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের পতনের কারণ ৪৩
আগস্ট বিপ্লবের সুফল ৪৪
১৯৭৫-এর সামরিক বিপ্লব ৪৬
মুজিব হত্যার বিচার ৪৭
খন্দকার মোশতাক আহমেদের মন্ত্রিসভা ৪৮
শেখ হাসিনার ভুল হিসাব ৪৮
সব ভালো যার শেষ ভালো তার ৪৯
শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে বিদেশী কলামিস্টদের মন্তব্য ৫০
ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতিবিপ্লব ৫৭
৩ নভেম্বরের বিদ্রোহের পর্যালোচনা ৬০
শেখ মুজিবের কুশাসনের আরও কতক তথ্য ৬০
প্রথম ঘটনা ৬২
দ্বিতীয় ঘটনা ৬৫
তৃতীয় ঘটনা ৬৫
বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা ৭১
শেখ মুজিবের আজব সুবিচার ৮২
শেখ মুজিবের ইমেজ খতম ৮৭
৩ থেকে ৭ নভেম্বরের নাটকীয় ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহ ৮৮
ঘটনাবলির বিশ্লেষণের ভিত্তিমূলক তথ্যাবলি ৮৯
নভেম্বরের পয়লা সপ্তাহের ঘটনাবলির পটভূমি ৯০
সরকারের পদক্ষেপসমূহ ৯১
সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন ৯২
সেনাপরিষদের কর্মসূচি ৯৩
আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি ৯৩
সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব ৯৪
খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের সূচনা ৯৪
ব্রিগেডিয়ার খালেদ অনমনীয় ৯৭
ডালিম-খালেদ আলোচনা ৯৯
আলোচনায় বিরতির পর আবার শুরু ১০০
বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কামরায় ১০২

www.pathagar.com

সেনা-সদরে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নিকট ১০২
৩ নভেম্বর দিবাগত রাত ১০৩
৩ ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ঃ এক প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় ১০৪
তাঁর বইটির পরিচয় ১০৫
বইটিতে লেখকের ভূমিকা ১০৫
লেখকের নিরপেক্ষতা ১০৭
বিপ্লবের তথ্যাবলির উৎস ১০৮
আগস্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়ই ৩ নভেম্বর বিপ্লব ১০৮
আগস্ট পরবর্তী অবস্থা ১০৯
ভগ্নহৃদয় খালেদ ১০৯
নাখোশ জিয়া ১১০
জিয়া বনাম মোশতাক-ওসমানী ১১২
২ নভেম্বর দিবাগত রাত ১১৩
৪ নভেম্বর ১১৪
মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক কর্নেলের হুমকিতে খালেদ ক্ষমতা পেলেন ১১৫
সশস্ত্র শাফায়াতের অনুপ্রবেশ ১১৬
আওয়ামীপন্থিদের মিছিলের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ১১৭
কর্নেল তাহেরের পৃথক বিপ্লব ১১৮
৫ নভেম্বরের অবস্থা ১১৮
৬ নভেম্বরের পরিস্থিতি ১১৯
বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী ১২০
রাত ১২টা বিদ্রোহ শুরু ১২১
মুক্ত জিয়া ১২১
বন্দি জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো ১২২
তাহেরের ক্ষমতা দখল-প্রচেষ্টা ১২৩
মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াই ১২৩
সেপাই-জনতার বিপ্লব ১২৫
খালেদ আসলেন ১২৬
৩ থেকে ৬ নভেম্বর দেশবাসী অন্ধকারে ১২৬
ঢাকায় জাগ্রত জনতার প্রচারপত্র ১২৭
ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ ১২৭
খালেদ কিভাবে নিহত হলেন ১২৯
খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের-একটি পর্যালোচনা ১৩০
কেন ব্যর্থ হলো অভ্যুত্থান? ১৩০
সিপাই-জনতা ভাই ভাই ১৩৩

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলছেন ১৩৪
লক্ষ লোকের আনন্দ মিছিল ১৩৫
১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর ১৩৫
তাহের ও জিয়ার ক্ষমতার লড়াই ১৩৬
টু-ফিল্ড ব্যারাক ১৩৬
কর্নেল হামিদের দেখা সিপাহী-জনতার উল্লাস ১৩৭
ঢাকা শহরে জনতার উল্লাস (৭ নভেম্বর) ১৩৭
৭ তারিখ বিকেল থেকেই সেনানিবাসে শঙ্কা ১৩৮
৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ১৩৯
৭/৮ নভেম্বর ঃ রক্তাক্ত রাত ১৪১
৮ নভেম্বর ১৪৩
৯ নভেম্বর ১৪৭
১০ নভেম্বর ১৪৮
কমান্ডার লগ এরিয়া ১৪৯
এবার সেপাই-অফিসার ভাই ভাই ১৫১
ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল তাহের ১৫২

www.pathagar.com

ঘটনাবহুল '৭৫ সাল

১৯৭৫ সালে দু'জন রাষ্ট্রনায়কের হত্যার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্চ মাসে সৌদি বাদশাহ ফায়সাল তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের গুলিতে নিহত হন। আর আগস্ট মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে সপরিবারে নিহত হন।

এ দু'জন রাষ্ট্রনায়কের হত্যার পরিণাম কিন্তু এক রকম নয়। বাদশাহ ফায়সালের তিরোধানে সৌদি আরব এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক থেকে বঞ্চিত হলো, যিনি গোটা মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। '৭৩ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে তেলের অস্ত্র ব্যবহার করে তিনি ইসরাইলের দখল থেকে মিসরের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতার গৌরব অর্জন করেন। বাদশাহ ফায়সাল আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ করার হুমকি দিয়ে কাবু করে ফেলেন। ইহুদী রাষ্ট্রের অন্ধ পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করার জন্যই তিনি তেলের অস্ত্র প্রয়োগ করেন। আমেরিকা এতো বড় অপমানের প্রতিশোধ নেবার এমনি উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো, যা রোধ করার সাধ্য বাদশাহর ছিলো না। বাদশাহর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আমেরিকায়ই কিশোর বয়স থেকে বড় হয়েছিলো। সে রাজবংশের সদস্য হিসেবে দেশে এসে অবাধে বাদশাহকে অতি নিকট থেকে গুলি করে হত্যা করার মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। বাদশাহর নিরাপত্তা রক্ষীরা অসহায় হয়ে ঘটনার পর প্রিন্সকে গ্রেপ্তার করলো এবং যথাসময়ে তার উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো। এ হত্যাকারীর মতো লক্ষ জনকে ফাঁসি দিলেও কি সামান্য ক্ষতিপূরণ হতে পারে? বাদশাহ ফায়সালের হত্যা গোটা মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বহীন করে পঙ্গুতে পরিণত করে ছেড়েছে।

খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন

সৌদি বাদশাহর উপাধি হলো, 'খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন'। হারামে মক্কা ও হারামে মদীনার খাদিম। কাবা শরীফের গেলাফে বড় বড় অক্ষরে উপাধিটি লেখা আছে। মিসরের স্বৈরশাসক জামাল আবদুন নাসের মিসরের রাজতন্ত্র উৎখাত হবার পর আরব জাতীয়তাবাদের মহানেতা সেজে সকল আরব দেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহের অপচেষ্টা চালায়। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাকে তখনই বিদ্রোহী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। আরব বিশ্বে মিসরই তখন সশস্ত্র বাহিনীর দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রসর ছিলো। বহু আরব দেশে সামরিক বাহিনী গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে মিসরীয় সামরিক অফিসার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো।

বাদশাহ ফায়সাল সৌদি সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে হঠাৎ একদিনের মধ্যে সকল মিসরীয় সামরিক অফিসারকে মিসরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরের দিনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে নিয়োগ করে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেন। এরপর থেকেই বাদশাহ ফায়সাল পাকিস্তানকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বাদশাহ ফায়সাল তখন থেকেই উপলব্ধি করেন যে, কর্নেল নাসেরের আরব জাতীয়তার তুফান থেকে ইসলামই তাকে রক্ষা করেছে। তার বড় ভাই বাদশাহ ইবনে সৌদের আমলে প্রিন্স ফায়সাল দীর্ঘকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ইসলামের এতোটা ভক্ত ছিলেন না। মাওলানা মওদূদী (র) থেকে শুনেছি যে, ইবনে সৌদ প্রিন্স ফায়সালের আধুনিকতার প্রতি আকর্ষণের কারণে শঙ্কিত ছিলেন। প্রিন্স ফায়সাল প্রাসাদ বিপ্লবের মাধ্যমে বড় ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মাওলানা মওদূদী এ শঙ্কার কথা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে প্রকাশ করেন।

কর্নেল নাসেরের আরব জাতীয়তার বিপ্লব থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বাদশাহ ফায়সাল ইসলামের মুসলিম পতাকাবাহীর বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তখন মাওলানা মওদূদী মন্তব্য করেন, "ইসলামই বাদশাহ ফায়সালকে আরব জাতীয়তার ফেতনা থেকে রক্ষা করেছে। মুসলিম উম্মাহর রক্ষকই ইসলাম। মুসলমানরা ইসলামের রক্ষক নয়। একমাত্র আল্লাহই ইসলামের রক্ষক। মুসলমান জাতি যখনই ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তখনই তারা রক্ষা পেয়েছে।"

ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর যাকির হোসাইন সৌদি আরব সফরে গিয়ে বাদশাহ ফায়সালকে বলেন, "ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা পাকিস্তান থেকে কম নয়। উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মাদরাসা দারুল উলূম দেওবন্দ, মুসলিম বিশ্বের গৌরব আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরতম মুসলিম স্থাপত্য শিল্প তাজমহল ভারতে অবস্থিত। কোন দিক দিয়েই পাকিস্তান ভারত থেকে অগ্রসর নয়। পাকিস্তান থেকে ভারত আপনার ভালোবাসা বেশি পাওয়ার দাবিদার।" এ কথার জওয়াবে বাদশাহ বললেন, "ভারত আমার বন্ধু, আর পাকিস্তান আমার ভাই। ভাইয়ের হক তো আলাদা থাকেই।"

পাকিস্তানের সবচেয়ে আধুনিক সুপরিকল্পিত জেলা শহর ব্রিটিশ আমলে কোন ইংরেজ শাসকের নামে 'লায়ালপুর' নামে নির্মিত হয়। বাদশাহ ফায়সালের নামে সে শহর "ফায়সালাবাদ' নাম ধারণ করে। জেলার নামও ফায়সালাবাদ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে ফায়সালাবাদ শহরে কয়েক বারই গিয়েছি। এমন সুপরিকল্পিত শহর আর কোথাও দেখিনি। শহরটির মাঝখানে বিশাল একটি বেদি। ট্রাফিক পুলিশের দাঁড়াবার মতো উঁচু হলেও বেদিটি গোলাকৃতির এবং যথেষ্ট প্রশস্ত। এটাকে ঘণ্টাঘর বলা হয়। ঐ বেদিতে দাঁড়ালে দেখা যায়, সেখান থেকে সাতটি প্রশস্ত রাস্তা সোজা শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ। দেখতে খুবই চমৎকার দেখায়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শহরের সাতটি প্রধান রাস্তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। গোল বিরাট বেদির পর রিং রোড ১০০ গজ পর পর সাতটি প্রধান সড়ককে বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ প্রধান সাতটি সড়ক ছাড়া শহরের সকল রাস্তাই গোল চাকতির মতো বৃত্তাকৃতির রিং রোডগুলোর দু'পাশে বাড়িঘর ও দোকানপাট। এ শহরটি পাকিস্তানের বস্ত্র শিল্পের রাজধানী।

বাদশাহ ফায়সালের শাহাদাতের দিন

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চের কথা। লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাসে কাউন্সিলর মি. সালেম আযযামের সাথে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে তার অফিসে দেখা করতে গেলাম। আমার সাথে ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সাথী জনাব আবদুস সালাম ও চৌধুরী মঈনুদ্দীন। তখন দুপুর এগারোটা।

www.pathagar.com

মি. সালেম আযযাম সৌদি দূতাবাসের পক্ষ থেকে সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখেন। তিনি তাদের সাথে সহযোগিতা করেন এবং তাদের কর্মতৎপরতায় উৎসাহ যোগান। আশির দশকেই তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে 'ইসলামী কাউন্সিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এর মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের সহযোগিতায় তিনি ইসলামের বিরাট খিদমত করেন। ১৯৮০ সালে তিনি 'Universal Islamic Declaration', ১৯৮১ সালে 'Universal Islamic Declaration of Human Rights' এবং ১৯৮৩ সালে 'A model of an Islamic Constitution' নামক তিনটি ঘোষণাপত্র ইংরেজি ও আরবী ভাষায় প্রকাশ করে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগণ সব দেশের লন্ডনস্থ দূতাবাস ও উল্লেখযোগ্য ইসলামী সংগঠনকে পাঠান। আমাকেও পাঠাতে ভুলেননি। আমি তা সযত্নে হেফাযত করে রেখেছি।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী ফোরাম ইউরোপের উদ্যোগে লন্ডনের বিশালতম হলে এক জমকালো আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন উক্ত জনাব সালেম আযযাম। কমিটিতে লন্ডনের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধি শরীক ছিলেন। আমাকে ঐ সম্মেলনের প্রধান অতিথি করা হয়। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিটি আমাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তিনি সম্মেলন উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমাকে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় সংবর্ধনা জানান। আল্লাহর রহমতে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। '৯৯ সালে লন্ডনে গেলে তার বাসায় যেয়ে দেখা করা কর্তব্য মনে করেছি।

দীনের একজন বিরাট খাদিম হিসেবে তার পরিচয় দিলাম। সৌদি দূতাবাসের কাউন্সিলর হিসেবেও তিনি দীনের একনিষ্ঠ খাদিম ছিলেন। সে হিসেবেই আমরা তিনজন তার অফিসে দেখা করতে গেলাম। কয়েক মিনিট কুশল বিনিময়ের পর আমি আলোচনা শুরু করতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। বিরক্তির সাথে ফোন ধরেই তিনি দূতাবাসের এক্সচেঞ্জকে বললেন, "এখন ফোন দিতে নিষেধ করেছিলাম, তবু দিলে কেন?" সাথে সাথে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে কথা শুনছেন এবং তার দেহে অস্থিরতার ভাব দেখা গেলো। ফোন ছেড়ে দিয়ে পেরেশান হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রয়টার ফোনে জানালো যে, বাদশাহ ফায়সাল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।" এ কথা শুনবার সাথে সাথে আমরা জোরে ইন্না লিল্লাহ বলেই নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। খবরটা বজ্রপাতের মতো আমাদের সবাইকে নিস্তব্ধ করে দিলো। কয়েক মিনিট পর জানতে চাইলাম যে, বাদশাহর অবস্থা সম্পর্কে রয়টার কিছুই বলেনি? একটু পরে জানাবে বলে বললো, এটুকু বলে দু'হাতে কপাল চেপে ধরে থাকলেন। আলোচনা দূরে থাক, কোন কথা বলার পরিবেশই রইলো না। আরও কয়েক মিনিট পর আবার ফোন বাজলো। অধীর আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝট করে ফোন রেখেই বললেন, Shotdead. বলেই চেয়ারের পেছন দিকে গা এলিয়ে দিলেন। বাকরুদ্ধ অবস্থায় সবাই চোখ নিচু করে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর সালেম আযযাম সাহেব সোজা হয়ে বসলে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করে হাত মিলায়ে বিদায় হয়ে এলাম।

www.pathagar.com

এতো বড় ঘটনা কেমন করে ঘটলো জানার জন্য বাসায় এসে রেডিও'র নিকট বসলাম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর আসতে লাগলো। পরের দিন দৈনিক পত্রিকায় বিরাট গুরুত্বসহকারে বিস্তারিত খবর জানা গেলো। সম্পাদকীয়তে বাদশাহ নিহত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হলো।

যোগ্য ও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বেশ প্রশংসাও সম্পাদকীয়তে দেখা গেলো। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় মন্তব্যের ফটোকপি আমার হাতে পৌঁছলো। শিরোনামটা ভুলবার নয়, 'রাজর্ষি ফায়সাল' নামে সম্পাদকীয়তে বাদশাহর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আবেগময় শ্রদ্ধার কথাগুলো মনে দাগ কেটেছিলো।

শেখ মুজিব হত্যা

বাদশাহ ফায়সালের হত্যায় গোটা মুসলিম উম্মাহ শোকাভিভূত হয়েছে। তার তিরোধানে উম্মাহর নেতৃত্বে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও পূরণ হয়নি। তিনি উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। তাই উম্মাহর বর্তমান সংকটে তার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যার প্রতিক্রিয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে। রাষ্ট্রপ্রধানের নিহত হওয়া কোন দেশের জন্যই গৌরবের বিষয় নয়। সপরিবারে নিহত হওয়া অবশ্যই বেদনাদায়ক।

১৯৭০, ৭১ ও ৭২ সালে শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার যে উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন এর নযীর বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। ১৯৭২-এর শুরুতেই ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছর পর এমন নৃশংসভাবে সপরিবারে নিহত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিবাদে দেশের কোথাও ২০/২৫ জনের একটা মিছিলও বের হলো না। তার দলের নেতৃবৃন্দ, এমপিগণ, বাকশালের স্বেচ্ছাসেবকগণ, এমনকি শেখ মুজিব সরকারের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনীও এতো বড় ঘটনার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিক্রিয়াও প্রদর্শন করলো না। এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি হতে পারে?

শেখ মুজিবের মৃতদেহ দীর্ঘ সময় সিঁড়িতেই পড়ে রইলো। ঢাকায় জানাযার ব্যবস্থাও কেউ করলো না। সেনাবাহিনীর উদ্যোগে হেলিকপ্টারে লাশ নিয়ে শেখ সাহেবের গ্রামের বাড়িতে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে অল্প কিছু লোক ডেকে দায়সারাভাবে জানাযা পড়া হয়। মুজিব হত্যার মতো এতো বড় ঘটনায় মনে হয় সারা দেশে জনগণ খুশি হলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তা না হলে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেই এলাকার লোক দলে দলে সমবেত হওয়ার কথা।

হত্যাকারী সামরিক অফিসাররা সামরিক শাসন কায়েম করতে পারতেন। এ জাতীয় ঘটনার পরিণতি সামরিক শাসনই হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পরিণতিই দেখা গেলো। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা যে শূন্যের কোঠায় নেমে গিয়েছিলো, সে কথা আওয়ামী লীগ নেতারা, মুজিব সরকারের মন্ত্রী ও এমপিগণ এবং তিন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানরা ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। রক্ষীবাহিনী প্রধান তোফায়েল আহমদও তা অনুভব করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

মুজিব সরকারের মন্ত্রিসভার সিনিয়র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুজিব সরকারের অন্যান্য বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবের মনোনীত এমপিগণও নতুন সরকারকে মেনে নেয়। তাই জাতীয় সংসদ ভেঙে দেবার প্রয়োজন হয়নি। জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল লন্ডন যেয়ে মন্তব্য করলেন যে, "ফিরাউনের পতন হয়েছে"। এমন বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও মালেক উকিল শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে ফিরে আসবার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুজিব হত্যার পরও মুজিবের দলই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর আর্মি ক্যু করার পূর্ব পর্যন্ত এ দলই ক্ষমতাসীন ছিলো।

লন্ডনে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া

লন্ডনে বিরাটসংখ্যক বাঙালি বসবাস করেন। ইস্ট লন্ডনেই তাদের অধিকাংশের অবস্থান। আমিও ইস্ট লন্ডনেই থাকতাম। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবূ সাঈদ চৌধুরী লন্ডনকে কেন্দ্র করে বহির্বিশ্বে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ইয়াহইয়া সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রেরিত পাকিস্তান ডেলিগেশনের সদস্য ছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিদ্রোহ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদান করায় লন্ডনে তিনি এ আন্দোলনের নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেন। এভাবেই লন্ডন বহির্বিশ্বে এ আন্দোলনের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাই আমার ধারণা ছিলো যে, মুজিব হত্যার বিরুদ্ধে লন্ডনে প্রচণ্ড প্রতিবাদ বিক্ষোভ হবে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না। যাদেরকে বঙ্গবন্ধু প্রেমিক বলে জানতাম তাদেরকেও নিশ্চুপ মনে হলো। এ খবর শুনে কেউ ইন্না লিল্লাহ বলেননি বলে অনেকেই মন্তব্য করলেন।

আমি কীভাবে খবর পেলাম

গ্রীষ্মকালে ঢাকার সময় থেকে লন্ডনের সময় ৬ ঘণ্টা পেছনে। ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত ৩টায় যখন মুজিব হত্যা ঘটে তখন লন্ডনে সন্ধ্যা ৯টা। আরও সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর আড়াইটায় (১৫ আগস্ট) আমি জায়নামাযে বসে ফজরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন দিন ১৮ ঘণ্টা দীর্ঘ এবং রাত মাত্র ৬ ঘণ্টা স্থায়ী। ৯টায় মাগরিবের নামায, আর ভোর তিনটায় ফজরের নামায। ফোন বাজলো। এ সময় কখনও ফোন আসে না। মনে করলাম, কেউ ভুলে ফোন করেছে, ছেড়ে দেবে। বেশ কয়েক মিনিট ফোন বাজতেই থাকলো। বিরক্ত হয়ে ফোন উঠালাম। পরম বন্ধু ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরীর অতি পরিচিত গলা। বললেন, ঘুম ভাঙালাম নাকি? বললাম, "জেগেই ছিলাম। এ সময় ফোন আসার কথা নয় বলে দেরিতে উঠালাম। ব্যাপার কী?" ঢাকা থেকে মুজিব হত্যার খবর ফোনে পেয়ে সর্বপ্রথম আমাকে জানালেন। খুব বিস্মিত হলাম। ফজরের নামায শেষে রেডিও থেকে সঠিক খবর যোগাড় করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

ফজরের নামাযে আমার ভাতিজা (যার বাড়িতে ছিলাম) রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও আদরের নাতি শাহীন ছাড়াও একজন মেহমান জামায়াতে শরীক হন। তিনি হলেন অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম (বর্তমানে মুহাম্মদপুর সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপাল)। তিনি তখনও শিক্ষক সংগঠনের নেতা ছিলেন। সে হিসেবেই তিনি এক আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। ঐ দিনই তার ঢাকা রওয়ানা হয়ে আসার কথা ছিলো। তিনি ফিরবার পথে লন্ডন হয়ে আসছিলেন এবং আমি ঐ বাড়িতে থাকি বলে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি আমার আত্মীয় এবং ছোট ভাই-এর মতো স্নেহভাজন। তার নানা আমার দাদার মামাতো ভাই এবং গ্রামে একই পাড়ার অধিবাসী। তার আম্মা আমার প্রিয় ফুফু ছিলেন।

নামাযের পর তাঁকে বললাম, "খোকা! (তার ডাক নাম) আজ তোমার ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না।" সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললো, কেন, কী হয়েছে? আমার মুখে অপ্রত্যাশিত এতো বড় খবর শুনে সবাই রেডিও নিয়ে বসে গেলো। সর্বপ্রথম রাশিয়ার খবরে এর সত্যতা জানা গেলো। ভারতের রেডিও থেকে কিছুই বললো না। আমরা কেউ রেডিও থেকে সরে যেতে পারছিলাম না। দু'ঘণ্টা পর বিবিসি থেকে খবরটা জানার পর নিশ্চিত হলাম। এতো বড় ঘটনার পর কোন বিমান ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে না মনে করেই খোকাকে ঐ কথা বলেছিলাম।

১৬ আগস্টের পত্রিকা

১৬ আগস্টে প্রকাশিত লন্ডনের সকল দৈনিক পত্রিকায় শেখ মুজিবের একাধিক বড় বড় ফটোসহ বিস্তারিত খবর পড়ে জানতে পারলাম যে, সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের লোকেরা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে।

পত্রিকায় "Strange Public Reaction" শিরোনামে যা লেখা হয়েছে তাতে বুঝা গেলো যে, মুজিব হত্যায় জনগণ শোক প্রকাশ না করে আনন্দ-উল্লাস করেছে। উক্ত লেখার একাংশ নিম্নরূপ ঃ

It was the 15th August, Friday. Curfew was clamped on the capital city. To facilitate Friday prayers carfew was withdrawn for two hours. People in large number passed the streets in festive mood as if they were observeing a national festival.

অর্থাৎ ঐ দিনটি ১৫ আগস্ট শুক্রবার ছিলো। রাজধানী শহরে কারফিউ লাগানো ছিলো। শুক্রবারের নামাযের সুবিধার জন্য কারফিউ দু'ঘণ্টার জন্য উঠিয়ে নেওয়া হলো। জনগণ বিরাট সংখ্যায় উল্লাস প্রকাশ করে রাস্তায় চলছিলো, যেন তারা কোন জাতীয় উৎসব পালন করছে।

মুজিব হত্যার পটভূমি

'৭১ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে এদেশের জনগণ তার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছে ও রোযা মান্নত করেছে। ১৯৭৩ থেকে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা এতো দ্রুত শূন্যের কোঠায় চলে যাওয়া সত্যিই এক মহাবিস্ময়। '৭৫-এর ১৪ আগস্ট দিবাগত শেষ রাতে তিনি স্ত্রী ও শিশুপুত্রসহ এমন নির্মমভাবে নিহত হওয়ার মতো

www.pathagar.com

চরম বেদনাদায়ক খবর শুনে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে জনগণ সামান্য শোক প্রকাশ করেছে বলেও জানা যায়নি। সর্বস্তরের জনগণ শুধু পরম স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেনি; ব্যাপকভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছে। এমন গণপ্রতিক্রিয়ার ফলেই শেখ মুজিবের অন্ধ প্রেমিকরাও দেশের কোথাও সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠ আবদুল কাদের সিদ্দিকী (বঙ্গবীর খ্যাত) দেশের সীমানার বাইরে ভারতে গিয়ে প্রতিবাদ করেন।

শেখ মুজিবের এমন করুণ পরিণতির কারণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে। এ বিষয়ে তার অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপে যে পদ্ধতিতে দেশটি স্বাধীন হয়েছে আমার ধারণা যে, তিনি এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেননি। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে বিচ্ছিন্ন করতে অবশ্যই সচেষ্ট হতেন। সে উদ্দেশ্যেই তিনি '৭০ সালেই পূর্ব-পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ নামকরণ করেন। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি হিসেবে ইতিহাস শেখ মুজিবুর রহমানকেই স্বীকৃতি দেবে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে জনগণের নয়নমণি হিসেবে রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা থাকলে তিনি তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর মন জয় করতে সক্ষম হতেন। এতো অল্প সময়ে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে গণধিক্কৃত হিসেবে এমন করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতেন না।

শেখ মুজিবের ব্যর্থতার কারণ

প্রথম কারণ ঃ শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনার নিরঙ্কুশ সুযোগ পাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে আওয়ামী লীগের বিজয় হিসেবে গণ্য করেন। সরকারি কর্তৃত্বের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আওয়ামী লীগের লোকদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতাদের চেয়ে অন্যান্য মহলের লোকেরাই মুক্তিযুদ্ধে অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের কেউ আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন না।

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার একাংশ সরাসরি আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন। সর্বমহলের লোকই দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

তাই স্বাধীন বাংলাদেশের ঐ পরিবেশে শেখ মুজিব যদি আওয়ামী লীগ সরকারের বদলে জাতীয় সরকার গঠন করতেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যাদের যে ভূমিকা ছিলো এর ভিত্তিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করতেন তাহলে হয়তো তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে দেশগড়ায় এগিয়ে যেতে পারতেন। সরকারি ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কুক্ষিগত রাখায় বহু মুক্তিযোদ্ধা সরকারবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ শেখ মুজিব যাদেরকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে গড়ে তুলেছেন বটে; কিন্তু তাদেরকে গণতান্ত্রিক নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি তার দলকে একটি ফ্যাসিবাদী

www.pathagar.com

বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেন। পেশিশক্তি প্রয়োগ করে নিজের ও দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি তার মজ্জাগত। তার গোটা রাজনৈতিক জীবন এ কথার জীবন্ত সাক্ষী।

কতক উদাহরণ

এক. ১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর বিরাট অবদান ছিলো। অবিভক্ত ভারতে তিনি আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন।

বেঙ্গল মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেম গ্রুপ ও খাজা নাযীমুদ্দীন-নূরুল আমীন গ্রুপে বিভক্ত ছিলো। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় বেঙ্গল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার নির্বাচনে নাযীমুদ্দীন বিজয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ঢাকায় মুসলিম লীগের যুব নেতাদের প্রায় সবাই সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেমের ভক্ত হওয়ায় খাজা নাযীমুদ্দীন গ্রুপ তাদেরকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কোন দায়িত্বে আসতে দেয়নি।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর বংশধররা খাজা নাযীমুদ্দীন গ্রুপে মর্যাদার আসনে ছিলেন। এ গ্রুপ মাওলানা ভাসানীকেও কোন পাত্তা দিতে রাজি ছিলো না।

সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেম গ্রুপের নেতারা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক টাঙ্গাইলের শামসুল হককে এ দলের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ দলের পক্ষ থেকে সভাপতি মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "খাজা নাযীমুদ্দীনের মুসলিম লীগ নওয়াব খাজাদের দল। জনগণ তাদের সাথে নেই। আমরা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করলাম।" জনগণ শব্দের আরবী হলো আওয়াম। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম রাখা হলো। মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পাকিস্তান কায়েম হয়। সে সময় এ নামই জনপ্রিয় থাকায় অন্য কোন নামে দল গঠন না করে এ নামের সাথে আওয়ামী নাম যোগ করা হয়।

এ দলকে দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনে এ দলের সেক্রেটারিকে গ্রেপ্তার করে। সেক্রেটারি শামসুল হক কারাগারে বিনা বিচারে আটক থাকাকালে কিছু লোক ষড়যন্ত্র করে শামসুল হকের স্ত্রী অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ফলে শামসুল হক মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এ অবস্থায় শেখ মুজিব কৌশলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদটি দখল করেন। তখন শামসুল হকের ভক্তদের মুখে শুনেছি যে, ঐ ষড়যন্ত্রের পেছনে শেখ মুজিবের হাত অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো।

দুই. ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কলকাতায় যেয়ে শেরে বাংলার আপত্তিজনক বক্তব্য দেবার অজুহাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী (বগরা) হক মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করেন। এরপর যুক্তফ্রন্টের প্রধান দু'দল

www.pathagar.com

শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। সংসদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে শেরে বাংলার দল ক্ষমতাসীন হয়।

মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হলেও দলের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানই দলীয় কর্মীদের নেতৃত্ব দেন। মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দেন। আর শেখ মুজিব দলের সংগঠক ও দলীয় জনশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই দলের নিয়ন্ত্রণ শক্তি তারই হাতে ছিলো। তিনি যখনই যেখানে দলীয় শক্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন তাতে বাধা দেবার সাধ্য কারো ছিলো না। নিজ দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপক্ষকে পেশিশক্তি প্রয়োগ করে শায়েস্তা করার জন্য সকল প্রকার কর্মই তার নিকট বৈধ ছিলো। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তার দলীয় জনশক্তিকে এ ফ্যাসিবাদী শিক্ষাদান করতে সক্ষম হন।

১৯৫৬ ও ৫৭ সালে আওয়ামী লীগ (ইতোমধ্যে সংসদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দাবি মেনে নিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িককরণের প্রয়োজনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ উৎখাত করা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি দলীয় গঠনতন্ত্রে শামিল করা হয়) কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন থাকাকালে মাওলানা ভাসানী সরকারের আমেরিকা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি গোটা পাকিস্তানের বামপন্থি নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় সমবেত করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তার ফ্যাসিস্ট বাহিনী ন্যাপ গঠনের উদ্দেশ্যে সমবেত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উপর ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই বর্বর আক্রমণ চালায় এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে ন্যাপের জনসভা বানচাল করে দেয়।

তিন. ১৯৬৮ সালে আইয়ুবের স্বৈরশাসনবিরোধী PDM (Pakistan Democratic Movement) পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভার আয়োজন করে। শেখ মুজিব তখন জেলে। তার যোগ্য অনুসারী তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে আওয়ামী বাহিনী বিশাল ক্যানভাসে আঁকা শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে PDM-এর মঞ্চ দখল করে তারাই মাইকে বক্তৃতা দেন।

চার. ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে সর্বপ্রথম বিশাল আকারে নির্বাচনী জনসভা করে। এ সভায় শেখ মুজিব প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন। আগামী নির্বাচনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের দখলে আনতে হবে, এটাই তার সারকথা। শেখ মুজিবের দল শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই আছে, পশ্চিম-পাকিস্তানে তার দলের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতা হিসেবে তিনি পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতির যোগ্যতা হারিয়েছেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক রাজনীতি অচল। সুতরাং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের দখলে আনতে হলে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল আসন আওয়ামী লীগকেই দখল করতে হবে। এ অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানে আর কোন দলকে রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া যায় না।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা করার ঘোষণা শেখ সাহেবের সহ্য হওয়ার কথা নয়। তাই জামায়াতের জনসভার পোস্টার রাতে লাগালে সকালেই ছিঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাইক পাবলিসিটিতে ব্যাপক হামলা করা জরুরি মনে করা হয়। জনসভায় গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েও যখন জনসভা পণ্ড করা গেলো না তখন ঢাকার কাদিয়ানী ডিসি পুলিশের সাহায্যে গুণ্ডাদেরকে ময়দানে ঢুকিয়ে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সফল করলেন।

পাঁচ. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম হয়। তার তৈরি আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বাহিনী তখন সশস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তারা ভারত থেকে অস্ত্র ও ট্রেনিং পেয়ে আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

শেখ সাহেব তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশে আইনের শাসন কায়েম করতে ব্যর্থ হলেন। তার উগ্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তার তৈরি লোকদের দ্বারা যে দেশ শাসন করা সম্ভব নয় তা প্রমাণিত হয়ে গেলো।

'৭০-এর নির্বাচনী বহু জনসভায় আমি শেখ মুজিবকে সম্বোধন করে বলেছি, "শেখ সাহেব! এ কথা মনে রাখবেন, গুণ্ডামি করে অন্য দলের সভা পণ্ড করা যায়, নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়, ক্ষমতা দখলও করা যায়, কিন্তু গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। যারা পেশিশক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তারা এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না।" দেশ শাসনে শেখ মুজিবের চরম ব্যর্থতার আসল কারণ এখানেই নিহিত।

শেখ মুজিবের কুশাসন

শেখ মুজিবুর রহমানের কুশাসনের কিছু খণ্ডচিত্র বিভিন্ন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক প্রখ্যাত রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব অলি আহাদের লেখা 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫' পুস্তক থেকে ঃ

প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ মুজিব

"১১ জানুয়ারি (১৯৭২) টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া একটি অতি পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের। কলেজ জীবন হইতে বন্ধুত্ব কিন্তু কলকাতায় প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমাদের মত ভিন্নদলীয় জাতীয়তাবাদীদের সহিত শোভনীয় আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। যাহা হউক, টেলিফোনে তাজুদ্দিন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমাকে বলেন, শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি ও প্রস্তাবও করিয়াছি। কারণ তিনি যেকোন পদেই বহাল থাকুন না কেন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই রাষ্ট্রপ্রশাসন পরিচালিত হইবে। শেখ সাহেবের মানসিক গড়ন তুমিও জান; আমিও জানি। তিনি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত। অতএব ক্ষণিকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টারি কেবিনেট পদ্ধতির প্রশাসন প্রহসনে পরিণত হইবে। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকিলে নিয়মতান্ত্রিক নাম-মাত্র দায়িত্ব পালন না করিয়া মনের অজান্তে কার্যতঃ ইহাকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রশাসনে পরিণত করিবেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্বাচনের কথা ভাবিতেছি। তোমার মত কি?

www.pathagar.com

তদুত্তরে তাঁহাকে বলি, "তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। নামমাত্র প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পালন শেখ সাহেবের শুধু চরিত্র বিরুদ্ধ হইবে না; বরং উহা হইবে অভিনয় বিশেষ। কেননা ক্ষমতার লোভ তাহার সহজাত।" তাজুদ্দিন টেলিফোনের অপর প্রান্তে সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি জানিতাম, মৌলিক প্রশ্নে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হইবে না।"

১২ জানুয়ারির এক ঘোষণায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু উত্তরকালে ঘটনাপ্রবাহে বন্ধুবর তাজুদ্দিনের সদিচ্ছার শেষ রক্ষা হইল না। (পৃষ্ঠা : ৫৩৫-৫৩৬)

কল-কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ কলমের এক খোঁচায় দেশের যাবতীয় কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। পূর্ব হইতে কোন ইনভেনটরি তৈয়ার না করিয়া প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে মিল কল-কারখানার পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হইল। অবশ্য পূর্বেই পরিত্যক্ত মিল কল-কারখানাগুলোতে প্রশাসক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এদিকে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর কোন কোন মিল-কারখানার মালিকদের তাদের স্ব স্ব মিলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা নামধারী শ্রমিকদের অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সাবেক অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসকদিগকে দালাল আখ্যাদান ও ভীতি প্রদর্শন মিল-কারখানার ব্যবস্থাপনাকে প্রহসনে পরিণত করে এবং সামগ্রিক উৎপাদনসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ কল-কারখানাই অযোগ্য প্রশাসক ও শ্রমিক নেতৃত্বের যোগসাজশে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়। অবশ্য ইহাই ছিল স্বাভাবিক, কেননা যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কল-কারখানা ধ্বংসের জন্য ভারতীয় মাড়োয়ারি গোষ্ঠী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাভাবে লিপ্ত, তখন শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার ত্যাগী, সচেতন ও সজাগ দেশপ্রেমিক শক্তিকে সুসংহত ও সংগঠিত না করিয়া সর্বনাশা সস্তা বুলির আশ্রয়ে আসর বাজিমাত করার তালে ছিলেন। আর তাই অন্য কিছু বিবেচনা ও বাস্তবতা বিচার না করিয়াই জাতীয় শিল্প ও অর্থনীতিকে কলমের এক খোঁচায় ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে তাহারা এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় অভিজ্ঞ নেতৃত্ব তাদের শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার মতো সর্বনাশা পথ কেন মাড়ায় নাই, তাহা অনুধাবন করিবার মতো ধীশক্তি শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কোন নেতার ছিলো না। তদুপরি ছিলো রুশপন্থিদের উসকানি। ফলত মুজিব সরকারের চরম অবিমৃশ্যকারিতাই দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। কথায় বলে, দেবদূতগণ যেখানে যাইতে সাহস পায় না মূর্খরা তড়িঘড়ি করিয়া সেখানে প্রবেশ করে।

যুব সমাজের অধঃপতন, দেশময় নৈরাজ্য

দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ও শ্রেণীর লোক মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ছাত্র-সম্প্রদায়। "দাসত্ব বরণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়"—এই ছিল ছাত্র সমাজের দৃঢ় পণ। দেশের স্বার্থে উৎসর্গিত-প্রাণ এই ছাত্রসমাজ ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) বিজয় দিবসের পর হইতেই নেতৃত্বের চরিত্রহীনতা ও ভ্রান্তনীতির দরুন ত্যাগের মহিমা ও দেশপ্রেমের তাৎপর্য অনুধাবন করিবার মতো অনুকূল আবহাওয়া হইতে

www.pathagar.com

নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কারণে যে নয় মাস তাহারা পড়াশুনা করিতে পারে নাই, সেই নয় মাস ছাত্র-সম্প্রদায় কর্তৃক ত্যাগ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা বছরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তাহাদের যথারীতি অংশগ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত ছিল জাতীয় স্বার্থ। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত কোর্সে পরীক্ষা দিলে বা বিজ্ঞান পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ব্যতীত ডিগ্রি গ্রহণ করিলে অথবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অজুহাতে ঢালাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দাবি আদায় করিলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হারাইয়া যায় অর্থাৎ ডিগ্রি অর্থহীন হইয়া পড়ে। জ্ঞানার্জনে বা বিদ্যা শিক্ষায় কোন সংক্ষিপ্ত পন্থা নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিহীনতার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও শিক্ষা বিভাগীয় সুপণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী বলিয়া পরিচিত মহল এই সময়ে শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজন করিয়াছেন, উহাই যে তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ বিবেকবান মাত্রই তাহা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বস্তুত অস্বীকার করার উপায়ও নাই যে, নীতিহীন নেতৃত্ব অস্ত্রের ঝনঝনানির নিকট শিক্ষাগুরুদের আত্মসমর্পণ, শিক্ষাঙ্গনে চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল ও জ্ঞানার্জন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টিতে একই শ্রেণীর মতলববাজ মহলের সায় ও উৎসাহ যুবসমাজকে অধঃপতনের আবর্তে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এবং শিক্ষাঙ্গনই যেহেতু এ দেশের নাগরিক সচেতনতার মূল কেন্দ্র, সুতরাং পরিণতিতে দেশময় নৈরাজ্য সৃষ্টিতে দেরি হয় নাই। (পৃষ্ঠা ৫৪১ ও ৫৪২)

পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাহার আওয়ামী লীগ সরকার অস্ত্র উদ্ধার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত নিজস্ব বেসরকারি লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কিংবা ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত রক্ষীবাহিনীর যথেষ্ট অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ দান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এমনকি ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, মারপিট, লুট, বলাৎকার, ছিনতাই, জবর-দখল ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হত না। কেননা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবর্গ এবং সংসদীয় সদস্যগণের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ শুধু নয়; বরং বাংলাদেশ রাইফেলস এবং এমনকি সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইত। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার আর কাহাকে বলে? কথায় ও কাজে গরমিলের দরুন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অচিরেই আস্থা হারাইয়া ফেলেন। তাই তাহার আবেদন সত্ত্বেও অস্ত্রধারীরা অস্ত্র জমা দেয় নাই, অনেকে স্বীয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মারাত্মক মারণাস্ত্রেরও আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আর তাহা এই যে, মালিককে অনেকটা বেপরোয়া করিয়া তোলে।

এভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন এমনকি আইন-আদালত পর্যন্ত যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইবার ফলে, আইন-কানুন ও প্রশাসনিক সদুদ্দেশ্য ও নিরপেক্ষতার উপর দেশবাসী ক্রমশ আস্থা হারাইয়া ফেলে। যেখানে আইনের শাসনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস, সেখানেই অবক্ষয়ের সূত্রপাত। আর কোথাও একবার অবক্ষয়ের সূত্রপাত হইলে তাহা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অলক্ষ্যে বিস্তৃতি লাভ

www.pathagar.com

করে। শান্তি ও স্বস্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি হয় অপসৃয়মাণ। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বাংলাদেশের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন, মূল্যবোধ ও চরিত্র এক কথায় সর্বস্তরে এই অবক্ষয়ের দৌরাত্ম্যই পরিলক্ষিত হইত। প্রশাসন কর্মচারীরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় সর্বক্ষণ ম্রিয়মাণ থাকিতেন। "রাষ্ট্রপতি আদেশ-৯" সরকারি কর্মচারীদের সকল ক্ষমতা, নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্ম উদ্যোগ ও উদ্যম অপহরণ করিয়া নিয়াছিল। ফলে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাই নতজানু প্রশাসনে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। (পৃষ্ঠা ৫৪৪ ও ৫৪৫)

আওয়ামী লীগের অবিবেচক রাজনৈতিক পদক্ষেপ

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অশান্তি হ্রাস বা দূরীকরণ দেশ ও জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোরবিরোধী ছিলো। অতীত ভূমিকার সূত্র ধরিয়া পাকিস্তান সরকার হিন্দু মহাসভা কিংবা পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করে নাই; অথবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাবিরোধী ভূমিকার কারণে কাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে নাই। অথচ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অপরিণামদর্শী বাংলাদেশ সরকার মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি; জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাবিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক মতভেদপ্রসূত অতীত ভূমিকার দরুন হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে দালাল আইনে আটক করা হয়। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাবই উক্ত অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপের জন্য দায়ী। ভারতফেরতা শরণার্থী ও অস্ত্রধারীরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে অবস্থানকারী কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ আনে এবং স্বীয় ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করিবার অপপ্রয়াসে গ্রাম-গ্রামান্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ফলে জনতা হইয়া পড়ে হতোদ্যম, নিরাশ ও হতাশ। (পৃষ্ঠা : ৫৪৫)

শেখ মুজিবের দাসখত

বিরোধীদলীয় কণ্ঠ স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লী গমন করেন এবং তথায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত ১৩ মে হইতে ১৬ মে পর্যন্ত এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ১৬ মে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যুক্ত ইশতেহারে শেখ মুজিবুর রহমান কার্যত ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত দিয়া আসেন। যেমন–

১. বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ী এলাকা ভারতকে দান।

২. বৎসর শেষে বাংলাদেশের আটটি জেলার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের চুক্তি ব্যতীতই ফারাক্কা বাঁধ চালু।

৩. পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অধিকার দান, অন্যকথায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়া করিডোর দান এবং

৪. ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক ভেনচার যথা– যৌথ-পাট কমিশন, যৌথ-শিল্প উদ্যম এবং ভারতীয় পণ্য ক্রয় নিমিত্ত আটত্রিশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করার পরিকল্পনা প্রণয়ন। (পৃষ্ঠা : ৫৫৮)

www.pathagar.com

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

এদিকে জীবনযাত্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মুজিব সরকারের ভ্রান্তনীতির দরুন সাধারণ ক্রেতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা, পাঁচ টাকার শাড়ির দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা; তিন টাকার লুঙ্গি পনেরো টাকা বা কুড়ি টাকা, দশ আনা বা বারো আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকা, আট আনা সেরের আটা ছয়/সাত টাকা, দুই আনা সেরের কাঁচামরিচ চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, তিন/চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি/নব্বই টাকা, আট আনা সেরের লবণ চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তৈল তিরিশ/চল্লিশ টাকা, সাত টাকা সেরের নারিকেল তৈল চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, এক টাকা সেরের মসুরির ডাল আট/নয় টাকা, সাত টাকার লাঙল ত্রিশ/চল্লিশ টাকা, ছয় টাকার কোদাল তিরিশ টাকা, একশত সাতচল্লিশ/দেড়শত টাকা ভরি স্বর্ণ নয়শত/এক হাজার টাকা, পনেরো টাকার কাফনের কাপড় আশি-নব্বই টাকা, দেড় টাকার কাঁচা সাবান আট/নয় টাকা অর্থাৎ এক কথায় জীবনযাত্রার সার্বিক সংকট মানুষকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে।

মুদ্রাস্ফীতি ও কালো টাকা মুজিব সরকারের ব্যর্থতার কারণে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিলো, আর উহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সর্বগ্রাসী দুর্নীতির মূল। দুর্নীতি দমন আইন ও বিধি ছিল বটে; কিন্তু তাহা যেন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। মুজিব সরকারের শাসনদৃষ্টে যে কাহারও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শাসক, শাসকের অনুগ্রহভাজন ও বিত্তবানদের জন্য এক প্রকার এবং শাসিত জনতা ও বিত্তহীনদের জন্য অন্য প্রকার, দেশে এই দুই প্রকার আইন প্রচলিত। তাই পূর্বে বর্ণিত কারণে শঙ্কিত, সর্বক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়াপন্ন ও আড়ষ্ট প্রশাসনযন্ত্র কালো টাকায় বিত্তবান, আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তি, সশস্ত্র বেসরকারি বাহিনী ও তাহাদের আশ্রয়পুষ্ট এবং উপরতলার আশীর্বাদপুষ্ট অথচ জঘন্য অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে ইতস্তত করিত; পারতপক্ষে আইন প্রয়োগে বিরত থাকিত। ফলে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনযন্ত্র এমনকি আইন আদালত পর্যন্ত অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে ঘটনারাজির পর্যালোচনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, শেখ মুজিবের আমলে তদীয় সরকারের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় সত্ত্বেও অমানিশার ঘোর কাটে নাই; অবহেলায় সুবর্ণ সুযোগ অতিবাহিত হইয়াছে; একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব-প্রসূত মহাত্যাগ বৃথা গিয়াছে। (পৃষ্ঠা : ৫৪৬ ও ৫৪৭)

কলঙ্কময় অধ্যায় ঃ ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠা

আগেই বলিয়াছি, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হইয়াছিল।

গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর গৃহীত সংবিধানটি সত্যায়ন (authenticate) করেন। গৃহীত এই সংবিধান মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয়, নির্বাচন অবাধও হয় নাই; সুষ্ঠুও হয় নাই।

১৯৭৩-এর মার্চের এই সাধারণ নির্বাচনে প্রশাসনিক ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ও দলীয় বাহিনীর যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও ঢালাও হুমকির

www.pathagar.com

সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তিন শতটি আসনের মধ্যে দুই শত তিরানব্বইটি আসন দখল করেন। ইহা তাহার দ্বারা সাংবিধানিক গণতন্ত্র, নীতি ও আদর্শ তথা ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শসমূহ লঙ্ঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইহার ফলে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনমনে মারাত্মক সন্দেহের উদ্রেক হয়। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সর্বগ্রাসী উৎকট ক্ষমতালোভ ও তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জঘন্য অপব্যবহারের মানসিকতা দেশ ও জাতিকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে নিক্ষেপ করে। এই সব পরিদৃষ্টে দেশী পত্র-পত্রিকাগুলিতে তো বটেই, ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তাহারাও মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনামুখর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে থাকে। এবং এই সবই শাসকগোষ্ঠীর নাভিশ্বাসের কারণ হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কঠোর সমালোচনার পটভূমিকায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বলে দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেন এবং ২৫ জানুয়ারিতে নিজেই একনায়কসুলভ শাসন পদ্ধতির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার ফলাফল অবশ্যই শুভ হয় নাই। এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে পরিবার-পরিজনসহ নিহত হন। (পৃষ্ঠা : ৫৪৭ ও ৫৪৮)

বাকশাল গঠন

যাহা হউক, জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষমতালোভী শেখ মুজিবুর রহমান তাহার পুতুল সংসদের সহায়তায় সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ঘোষণা করিয়া ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। তদনুযায়ী ঃ ১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৩. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ৬. বাংলা জাতীয় লীগ, ৭. বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ৯. জাতীয় গণতন্ত্রী দল, ১০. জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, ১১. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ১২. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ১৩. কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৪. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৭৫ সালের ২০ মে বাংলা জাতীয় লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করা হয়। শেখ সাহেব ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। নিজ শাসন পাকাপোক্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই তিনি সকল সংসদীয় সদস্যকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে 'বাকশালে' যোগ দিবার ফরমান জারি করেন। অন্যথায় সংসদ সদস্যপদ বাতিল। বিরোধী জননেতা আতাউর রহমান খান ২৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশালে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেও আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদ্বয় জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করা শ্রেয় মনে করেন। (পৃষ্ঠা : ৫৬২)

www.pathagar.com

নিম্নোক্ত অঙ্গসংগঠন গঠন করা হয় ঃ

জাতীয় কৃষক লীগ, সাধারণ সম্পাদক– ফনীভূষণ মজুমদার
জাতীয় শ্রমিক লীগ, সাধারণ সম্পাদক– অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
জাতীয় মহিলা লীগ, সাধারণ সম্পাদক– বেগম সাজেদা চৌধুরী
জাতীয় যুবলীগ, সাধারণ সম্পাদক– তোফায়েল আহম্মদ
জাতীয় ছাত্রলীগ, সাধারণ সম্পাদক– শেখ শহিদুল ইসলাম

এবং নিম্নোক্তদের দ্বারা কার্যকরী সংসদ গঠন করেন ঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান– চেয়ারম্যান,
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
৩. এম. মনসুর আলী সেক্রেটারি জেনারেল,
৪. খন্দকার মুশতাক আহমদ,
৫. আবুল হাসনাত মোঃ কামরুজ্জামান,
৬. আবদুল মালেক উকিল,
৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলী,
৮. শ্রী মনোরঞ্জন ধর,
৯. ড. মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরী,
১০. শেখ আবদুল আজিজ,
১১. মহিউদ্দীন আহমদ,
১২. গাজী গোলাম মোস্তফা,
১৩. জিল্লুর রহমান– সেক্রেটারি,
১৪. আবদুর রাজ্জাক– সেক্রেটারি।

পক্ষান্তরে রাজনীতিবিদ, সমর নায়ক, শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থা সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক মহলগুলোতেও বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়িয়া যায়। এই সব সুবিধাবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পতাকা লইয়া ফুলের মালাসহ দলে দলে শেখ মুজিবের চরণ পূজা করিবার নিমিত্তে তাহার নিকট গমন করে। এমনকি একশ্রেণীর মা-বোনও বাদ যায় নাই। ইহাদের এই ব্যক্তি পূজার মানসিকতায় উৎসাহী হইয়া শেখ মুজিব একদলীয় শাসন টেকসই করার নিমিত্তে যে কোন ধরনের সমালোচনার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিবার অসৎ প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক পত্রিকা বাতিল ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন (১৯৭৫) সারাদেশকে একষট্টি জেলায় বিভক্ত করিয়া ১৬ জুলাই তারিখে একষট্টি জন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সর্বব্যাপক অবাধ দুর্নীতি, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, পাচার, গুম, খুন, দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনিক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক পলিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির যোগানদার অর্থনীতিতে পরিণত করে, দেখা দেয় এক বিষময় ফল।

www.pathagar.com

পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রেতা-সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। ফলে কারখানার কাঁচাপাটের গুদামে শুরু হয় অগ্নিসংযোগ ও স্যাবোটেজ। সর্বত্র দেখা দেয় ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব; ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যুবরণ করে অসংখ্য দেশবাসী। বিরোধী কণ্ঠকে বিনা বিচারে আটক করার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হইয়া শেখ মুজিব দেশব্যাপী ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং তদনুসারে জরুরি আইন প্রণয়ন করা হয়। এভাবেই নিজ বুদ্ধির দোষে নিজ কর্মদোষে শেখ মুজিব ও তাহার আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালি জনতার দুশমনে পরিণত হইতে থাকেন। যে মুজিব ১৯৬৯-'৭০, '৭১ ও '৭২ সালে ছিলেন বাঙালির নয়নমণি, তিনিই ১৯৭৩-'৭৪ সালে রূপান্তরিত হইলেন বাঙালির চোখের বিষে। একদা যিনি ছিলেন জনতার কাতারে, তিনি ক্ষমতা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার অদম্য স্পৃহায় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী সংযোজন দ্বারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া এক দলের এক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তাহার নিজস্ব ক্ষমতার লোভ ও একশ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী, নীতিহীন বুদ্ধিজীবী ও চরিত্রহীন টেন্ডলের যোগসাজশে বাংলার সর্বত্র নগরে, বন্দরে, কল-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে-খামারে দিল্লীর দাসেরা আওয়াজ উঠাইতে থাকে ঃ "এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ!" (পৃষ্ঠা ৫৬৬ ও ৫৬৭)

আবুল মনসুর আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি সর্বমহলেই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান জনাব আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য হবার অল্পদিন পরই কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন। সর্বদিক দিয়ে তিনি শেখ মুজিবের মুরুব্বীস্থানীয় ছিলেন। চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের এটা বিরাট সৌভাগ্য যে, তার মতো একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও ধীরস্থির পরম শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পেয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে আবেগপ্রবণ শেখ মুজিব যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখন জনাব আবুল মনসুর আহমদ মৌখিক ও দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রতিটি ইস্যুতেই চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ পথনির্দেশমূলক উপদেশ দিতেন। আমি লন্ডনে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, শেখ মুজিবের সমর্থক ও বিরোধীরা ফটোকপি করে তার লেখা বিলি করতো। তার এসব লেখা পড়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করতাম। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন। তার সাথে হাত মিলাতেই তিনি শায়িত অবস্থায়ই আমাকে

www.pathagar.com

টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তার স্নেহপরায়ণতায় অভিভূত হলাম। তার স্ত্রী পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্নেহমাখা হাসিতে আমাকে আপ্লুত করলেন। লন্ডনে তার লেখার জনপ্রিয়তার কথা শুনালাম। তিনি আফসোস করে বললেন, "যাদের কল্যাণ কামনা করে লিখলাম তারা যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করতো তাহলে দেশের ইতিহাস ভিন্ন হতো।"

তার লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নামক বিরাট গ্রন্থ থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করছি, যা তার আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্রপ্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রকাশ পায়। ১৯৭৩ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

নির্বাচনে আশা-প্রত্যাশা

এই নির্বাচনটা ছিল বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগই দেশকে এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান দিয়াছে। হঠাৎ দেয় নাই, কারো চাপে পড়িয়াও দেয় নাই। আওয়ামী লীগ আজন্ম পার্লামেন্টারি পদ্ধতির দৃঢ় সমর্থক। সেই কারণেই তারা দেশকে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তারা বিশ্বাস করেন, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিই বাংলাদেশের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পন্থা।

কাজেই আসন্ন নির্বাচনে যাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে চেষ্টা আওয়ামী লীগেরই করা উচিত ছিলো। তাদের বোঝা উচিত ছিলো, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির অসাফল্য কার্যত আওয়ামী লীগেরই অসাফল্যরূপে গণ্য হইবে।

পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপন মানে বিরোধী দলের যথেষ্টসংখ্যক ভালো মানুষ নির্বাচিত হউন, সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সে দৃষ্টিতে যথেষ্ট উদারতা ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। রাজনৈতিক হরিঠাকুর হিসেবে আমি আওয়ামী নেতাদের কাউকে কাউকে আগে হইতেই উপদেশ দিয়াছিলাম। মুখে মুখেও দিয়াছিলাম, 'ইত্তেফাকে' একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াও তেমন উপদেশ দিয়াছিলাম। আমি এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিবার উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করিয়াছিলাম দুইটি কারণে। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার মধ্যে গোটা জাতির একটা ভাবাবেগ মিশ্রিত আছে। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ নৌকাকেই তাদের নির্বাচনী প্রতীক করিয়াছেন। নৌকা-প্রতীকের সাথে বাংলাদেশের ভোটারদের মধ্যে ভাবাবেগের ঐতিহ্য আছে। '৭০ সালের নির্বাচনে এই প্রতীক লইয়াই আওয়ামী লীগ এমন বিপুল জয়লাভ করিয়াছিলো। তার আগে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ঐ নৌকা প্রতীক দিয়াই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করিয়াছিলো।

কাজেই নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের প্রতি উদার হওয়া উচিত ছিলো। উদার হইতে তারা রাজিও ছিলেন। রেডিও-টেলিভিশনে বিরোধী দলসমূহের নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেও তাদের আপত্তি ছিলো না। কিন্তু পর পর কতকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আওয়ামী নেতারা কঠিন হইয়া পড়িলেন।

সরকারি দল হিসেবে দেশের সমস্ত দুর্দশা-দুর্ভাগ্যের জন্য সরকার দায়ী, এই মনোভাব হইতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হারাইবার যথেষ্ট কারণ তো ছিলোই, তার উপর বছরের শুরুতেই ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারিতেই, ভিয়েতনাম উপলক্ষে ছাত্রদের মিছিলের

www.pathagar.com

উপর গুলি চালানোর দরুন দুইজন ছাত্র নিহত ও অনেক আহত হয়। পরদিন দেশব্যাপী হরতাল হয়। ফলে দৃষ্টতই আওয়ামী লীগ ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারায়। মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নই সরকারবিরোধী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিলো। এই কারণেই ছাত্রলীগের লোকেরা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের অফিস পোড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া খবর বাহির হয়। তাতেও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয়। এই অজনপ্রিয়তা প্রসারিত হয় মফস্বলে সরকারের বর্ডার প্যাক্ট ও পাটনীতি উপলক্ষ করিয়া।

হিসাবে ভুল

এই দৃশ্যমান অজনপ্রিয়তার অতিরঞ্জিত ওভার এস্টিমেট করিলেন উভয়ই। আওয়ামী লীগাররা ঘাবড়াইলেন। আর বিরোধী পক্ষ উল্লসিত হইলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির খাতিরে আওয়ামী নেতৃত্ব নির্বাচনে কিছুটা উদার হওয়ার যে ইচ্ছা করিতেছিলেন, পরিস্থিতির এই অতিরঞ্জিত ভুল অর্থের ফলে সে মতের পরিবর্তন হইলো। অপরদিকে বিরোধী দলসমূহের মধ্যে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছিলো তা ভণ্ডুল হইয়া গেলো। ভাবখানা এই যে, আওয়ামী লীগ যেখানে এমনিতেই হারাইয়া যাইতেছে, সেখানে বিরোধী পক্ষের ঐক্য ফ্রন্ট করিবার দরকারটা কি? বিরোধী দলসমূহের আস্থা ও জয়ের আশা এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলো যে, একুশে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভা করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বদলীয় বিরোধী নেতা মাওলানা ভাসানী সাহেব পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকারবিরোধী বক্তৃতা করিতেছিলেন। একই সময়ে এই দুই সভায় দুই জনপ্রিয় নেতা বক্তৃতা করায় কোন্ সভায় বেশি লোকসমাগম হইয়াছিলো, তাহা লইয়া তর্ক পর্যন্ত বাধিয়াছিলো।

এমন অবস্থায় একদিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারে আরও বেশি জোর দিলেন। অপরদিকে বিরোধী দলসমূহের কোন্ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তাহা লইয়া তাহারা বিতর্কে অবতীর্ণ হইলেন। স্মরণযোগ্য যে, এই সময়ে কথা উঠিয়াছিলো স্বয়ং মাওলানা ভাসানীও নির্বাচনে দাঁড়াইবেন। বিরোধী দল নির্বাচনে জয়লাভ করিলে জনাব আতাউর রহমান খাঁ-ই প্রধানমন্ত্রী হইবেন, অধিকাংশ দলের মতে এটা ঠিক হইয়াই ছিলো। আওয়ামী লীগের কল্পিত আনপপুলারিটি যখন বিরোধী দলসমূহের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলো, তখন মাওলানা সাহেবের দলের এক নেতা প্রকাশ্যভাবেই বলিয়া ফেলিলেন যে, মাওলানা সাহেবের জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া যেইখানে বিরোধী দল নির্বাচনে জিতিতেছে, সেইখানে মাওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রী না হইয়া অপরে প্রধানমন্ত্রী হইবেন কেন?

আমি কিন্তু ঘরে বসিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম, আওয়ামী লীগের ডর ও বিরোধী দলের আশা দুইটাই অমূলক। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ মেজরিটিই পাইবে। আওয়ামী বন্ধুদের কাছে মুখে মুখে যেমন এ কথা বলিতেছিলাম, কাগজেও তেমনি লিখিতেছিলাম ঃ 'আওয়ামী লীগ শুধু আসন্ন নির্বাচনেই নয়' আগামী পঁচিশ বছরের নির্বাচনে জিতিবে এবং দেশ শাসন করিবে। আমি এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ শাসনকে ভারতের কংগ্রেসের পঁচিশ বছরের আমলের সাথে তুলনা করিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম,

www.pathagar.com

নেহরু-নেতৃত্বের কংগ্রেসের মতো মুজিব-নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পথে দৃঢ় থাকিলেই এটা অতি সহজ হইবে।

এই বিশ্বাসে আমি আওয়ামী নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, বিরোধী পক্ষের অন্তত জন-পঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে পার্লামেন্টে একটি সুবিবেচক গণতন্ত্রমনা গঠনমুখী অপজিশন দল গড়িয়া উঠিবে।

আমার পরামর্শে কেউ কান দিলেন না। বিরোধী দলসমূহের ঐ নিশ্চিত বিজয় সম্ভাবনার উল্লাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধ হয় সম্ভবও ছিলো না। রেডিও-টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তাহারা ঠিকমতো প্রচার চালাইতেও পারিলেন না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূর্ণিঝড় টুওর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরাও সরকারি যানবাহনের সুবিধা নিলেন।

অপজিশনের স্বপ্ন টুটিলো। মাওলানা সাহেব অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। প্রধানমন্ত্রী তাহার সাথে হাসপাতালে দেখা করিয়া তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া সর্বশেষ তুরুপ মারিলেন। নির্বাচনে অপজিশনের ভরাডুবি হইলো। (পৃষ্ঠা : ৬২৪-৬২৬)

নির্বাচন ফল ও কুফল

"৭ মার্চ নির্বাচন হইলো। ৩০০ সিটের মধ্যে ২৯২টি আওয়ামী লীগ ও মাত্র ৭টি অপরপক্ষ পাইলো। একটি সিটে একজন প্রার্থী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় তার নির্বাচন পরে হইলো। সেটিও আওয়ামী লীগই পাইলো। বিরোধী পক্ষের ৭টির মধ্যে জাসদের ৩, জাতীয় লীগের ১ ও নির্দলীয় ৩ জন নির্বাচিত হইলেন। দুইটি ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি কোন সিট পাইলো না। জাতীয় লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান খাঁ নির্বাচিত হইয়া তাহার পার্টির নামটা জীবন্ত রাখিলেন। পরে নির্বাচিত মেম্বারদের ভোটে যে ১৫টি মহিলা আসনের নির্বাচন হইলো তাহার সবকয়টি অবশ্যই আওয়ামী লীগই পাইলো। এইভাবে পার্লামেন্টের ৩১৫ জন মেম্বারের মধ্যে ৩০৮ জনই হইলেন আওয়ামী লীগের। মাত্র ৭ জন হইলেন অপজিশন।

এতে আওয়ামী-নেতৃত্বের আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। সে কর্তব্য অবশ্য শুরু হইয়াছিলো আগেই, নির্বাচন চলাকালেই। গোড়ার দিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব উদার হইতে পারেন নাই। কিন্তু নমিনেশন পেপার বাছাইয়ের দিনেই আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলো। শেখ মুজিব দুটি আসন হইতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। আওয়ামী লীগের আরও ৭ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে আওয়ামী নেতৃত্বের উদার হওয়ার কোনও অসুবিধা বা রিস্ক ছিলো না। বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, প্রফেসর মোজাফফর আহ্‌মদ, ডা. আলিমুল রাযী, জনাব নূরুর রহমান, রাজশাহীর মি. মজিবুর রহমান, জনাব অলি আহাদ, মি. সলিমুল হক খান মিক্কী, মি. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মি. যিল্লুর রহিম, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মি. বযলুস সাত্তার প্রমুখ জনপঁচিশেক অভিজ্ঞ সুবক্তা পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হইতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালোর জন্য উচিত ছিলো।

www.pathagar.com

তিন'শ পনেরো সদস্যের পার্লামেন্টে জনপঁচিশেক অপজিশন মেম্বার থাকিলে সরকারি দলের কোনই অসুবিধা হইতো না; বরঞ্চ ঐ সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপজিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইতো। তাহাদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইতো। সরকার দলও তাহাতে উপকৃত হইতো। তাহাদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারি দলের মেম্বাররা নিজেরা ভালো ভালো দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিতেন। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিতো। আর এসব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব।

আওয়ামী-নেতৃত্বের ভ্রান্তনীতি

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, শেখ মুজিব এই উদারতার পথে না গিয়া উল্টা পথ ধরিলেন। এই সব প্রবীণ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। জনাব আতাউর রহমানকে হারাইবার জন্য আওয়ামী-নেতৃত্ব যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, সেটাকে কিছুতেই নির্বাচন প্রচারণার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নীতি বলা যায় না। বরঞ্চ আমার বিবেচনায় সেটা ছিলো খোদ আওয়ামী লীগের জন্যই আত্মঘাতী। তার মতো ধীরস্থির অভিজ্ঞ গঠনাত্মক চিন্তাবিদ পার্লামেন্টের অপজিশন বেঞ্চের শুধু শোভা বর্ধনই করেন না, সরকারকে গঠনমূলক উপদেশ দিয়া এবং গোটা অপজিশনকে পার্লামেন্টারি রীতি-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এমন একজন ব্যক্তিকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার সর্বাত্মক চেষ্টা আওয়ামী নেতৃত্ব কেন করিলেন, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। কারণ এমন চেষ্টা যে মনোভাবের প্রকাশ, সে মনোভাব পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সাফল্যের অনুকূল নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অভিজ্ঞ ও প্রবীণ পার্লামেন্টারি নেতা কিছুতেই এমন আত্মঘাতী নীতির সমর্থক হইতে পারেন না। যদি খোদা-না-খাস্তা শেখ মুজিব কোনও দিন তেমন মনোভাবে প্রভাবিত হন, তবে সেটা হইবে দেশের জন্য চরম অশুভ মুহূর্ত।

কিন্তু আমি দেখিয়া খুবই আতঙ্কিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম যে, নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী নেতৃত্ব অপজিশনের প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেটা সাময়িক অবিবেচনাপ্রসূত ভুল ছিলো না। তারা যেন নীতি হিসেবেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্বাচনের ফলে অপজিশন একরূপ শূন্যের কোঠায় পৌঁছিয়াছিলো। কয়েকটি দলের এবং নির্দলীয় মেম্বার মিলিয়া শেষ পর্যন্ত তাহারা হইলেন মাত্র ৮ জন। অপজিশন ছাড়া পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই এই ছিন্ন ভিন্ন অপজিশনকে লালন করিয়া আমাদের আইনসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টের রূপ ও প্রাণ দিবার চেষ্টা শাসক দলেরই অবশ্য কর্তব্য ছিলো। শাসক দল সে কর্তব্য পালন তো করিলেনই না, ভিন্ন ভিন্ন দলের মেম্বাররা নিজেরাই যখন একত্রিত হইয়া জনাব আতাউর রহমানকে লিডার নির্বাচন করিলেন, তখনও সরকারি দল তাহাকে লিডার অব দি অপজিশন স্বীকার করিলেন না। নির্বাচনের পরে নয় মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এর মধ্যে পার্লামেন্টের দুই-দুইটা অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। তবু আমাদের পার্লামেন্টে কোন লিডার অব দি অপজিশন

www.pathagar.com

নাই। তার মানে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে আমাদের আইনপরিষদ আজও পার্লামেন্ট হয় নাই। যাহা হইয়াছে সেটা আসলে একদলীয় আইনসভা। এটা নিশ্চিতরূপে অশুভ। প্রশ্ন জাগে ঃ আমরা কি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছি? কিন্তু তা বিশ্বাস করিতে মন চায় না। কারণ এটা শুধু আওয়ামী লীগের বিঘোষিত মূলনীতিবিরোধীই নয়, তার নির্বাচনী প্রতীক নৌকারও তাৎপর্যবিরোধী। নৌকা চালাইতে যেমন দুই কাতারের দাঁড়ি লাগে, গণতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাই লাগে। যদি কোনও দিন নৌকার সব দাঁড়ি এক পাশে দাঁড় টানিতে শুরু করে, তবে সেদিন নৌকা আর যানবাহন থাকিবে না। হইবে সেটা মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তু। (পৃষ্ঠা : ৬২৬-৬২৯)

জাতীয় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি

এইসব বিভ্রান্তির মধ্যে প্রধান এই ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।' এটা সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি। অন্যান্য ক্ষতিকর বিভ্রান্তি মোটামুটি এটা হইতেই উদ্ভূত। এই বিভ্রান্তির সর্বপ্রথম ও প্রত্যক্ষ কুফল এই যে, এতে ভারত সরকারকে নাহক ও মিথ্যা বদনাম পোহাইতে হইতেছে। পাকিস্তান যদি ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে ভারতই ভাঙ্গিয়াছে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাসিলে ভারত সরকার সক্রিয় ও সামরিক সাহায্য করিয়াছেন। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে '৪৭ সালের ভারত বাঁটোয়ারার আর কোনও জাস্টিফিকেশন থাকিতেছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও জার্মানির মতোই ভারতেরও পুনর্যোজনের চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলায় সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে এই ধরনের কথা ও চিন্তা যে কত মারাত্মক, 'বিদগ্ধ' পণ্ডিতেরা তা না বুঝিলেও ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়করা তা বুঝিয়াছেন। তাই উভয় পক্ষই কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষধর সাপের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকার এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম প্রান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়াইয়াছেন। ওদিককার দখলিত ভূমি ও যুদ্ধবন্দি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর এদিকে বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলাদেশের মাটি হইতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছেন। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সুযোগেই ঘোষণা করিয়াছেন, "বৃহত্তর বাংলা গঠনের কোনও ইচ্ছা আমার নাই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতেরই থাকিবে। আমার দেশের বর্তমান চৌহদ্দি লইয়াই আমি সন্তুষ্ট। অন্যের এক ইঞ্চি জমিও আমি চাই না।"

বাংলাদেশ-নেতৃত্ব আরো একটা ভালো কাজ করিয়াছেন। বাঙালি জাতির সংখ্যাসীমা নির্দেশ করিয়াছেন সাড়ে সাত কোটি। এটা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা। এই ঘোষণার দরকার ছিলো। আমাদের বাঙালি জাতীয়তার মূলনীতিতে ভারতের আতঙ্কিত হইবার কারণ ছিলো। ভারতে পাঁচ-ছয় কোটি নাগরিক আছেন, যাহারা গোষ্ঠী, গোত্র ও ভাষায় বাঙালি। ইহারা এককালে ছিলেন সারা ভারতের চিন্তানায়ক। রাজনীতিতেও তাহারা

www.pathagar.com

সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়াছেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কংগ্রেস-নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তা গ্রহণ করিবার আগেতক ইহারা বাঙালি জাতীয়তার, বাঙালি কৃষ্টির, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের মুখর প্রবক্তা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর উপলব্ধিতে সেদিনকার সেই বাঙালি ভাষাবেগের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে কি-না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় এবং সে রাষ্ট্রের বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগানে ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যে 'যুক্তবাংলা' ও 'বৃহত্তর বাংলা'র আকর্ষণে বিভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। এমনিতেই পূর্ব-ভারতে একটু অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। তাহার উপর বাঙালি জাতীয়তার আবেগের ছোঁয়াচ লাগিতে দেওয়া উচিত হইবে না। এই কারণেই বাঙালি জাতীয়তার ব্যাপারে ভারত একটু সতর্ক। আমাদের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির এক নীতি জাতীয়তায় তাই ভারত সরকারের অনীহা। ভারত সরকারের দলিল-দস্তাবেজে, নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমাদের মূলনীতির তিনটার উল্লেখ থাকে। জাতীয়তাবাদের উল্লেখ থাকে না। বাংলাদেশের নেতৃত্ব ভারত সরকারের ও ভারতীয় নেতৃত্বের এই ইশারা বুঝিয়াছেন। তাই ঐ 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালি'র উল্লেখ। বস্তুত ভারতীয় বাঙালিরা আর রাজনৈতিক অর্থে নেশন নন। তারা এখন ভারতীয় নেশন। বাঙালির পলিটিক্যাল নেশনহুডের ওয়ারিসি এখন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উপর বর্তাইয়াছে।

লেজের বিষ

উভয় রাষ্ট্রের এ সুস্পষ্ট দৃঢ়তার লগুড়াঘাতে বিভ্রান্তির সাপের মাথাটা গুঁড়া হইয়াছে সত্য। কিন্তু সাপ আজও তার লেজ নাড়িতেছে এবং সাপের বিষ লেজে। তাই উভয় রাষ্ট্রের কোন কোন অরাজনীতিক ও 'বিদগ্ধ' বুদ্ধিজীবীরা 'পাকিস্তান ভাঙা' 'দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা'র একাডেমিক ও থিওরেটিক্যাল 'নির্ভুলতা' আজও কপ্‌চাইয়া যাইতেছেন। এই সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিসহ মন-অন্তর ও কলিজা দগ্ধ হইলেও তাহাদের মুখটা দগ্ধ হইতে এখনও বাকি আছে। তাই তাহাদের মুখে 'শাশ্বত বাংলা', 'প্রবহমান বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'হাজার বছরের বাংলা', 'গুরুদেবের বাংলা', 'বাংলার কৃষ্টি', 'বাংলার ঐতিহ্য' ইত্যাদি নিতান্ত ভাবাবেগের কবিত্বপূর্ণ কথাগুলিও রাজনৈতিক চেহারা লইয়া দেশে-বিদেশে বিষ ছড়াইতেছে। আমাদের দিক হইতেও 'বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'কবিগুরুর বাংলা', 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি প্রতিধ্বনি করিয়া 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা'র ব্যাপারটাকে দুইটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সীমান্তরেখা মসিলিপ্ত হইতে দিতেছি। আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থা, আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত একই কবিগুরুর রচনা হওয়াটারও বিকৃতিকরণের সুযোগ করিয়া দিতেছে। পাকিস্তানসহ দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যে আজও আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দিতেছে না, আমাদের দেশবাসীসহ দুনিয়ার সব মুসলমানরা যে ভারত সরকারের প্রতি নাহক ও অন্যায় বৈরীভাব পোষণ করিতেছে, ইহার প্রধান কারণও এই বিভ্রান্তি।

অথচ প্রকৃত অবস্থাটা এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙ্গে নাই; 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মতো দুই

www.pathagar.com

পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাহাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।" (পৃষ্ঠা : ৬৩২-৬৩৪)

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর রাজনীতির তিনকাল গ্রন্থ থেকে

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী শেখ মুজিবের পরম ভক্ত, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক। তার রচিত পুস্তক থেকে বাকশাল গঠন সম্পর্কিত বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

"এর মধ্যে '৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের এক সভা ডাকা হয়। এ সভায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য শুরু হয়। যারা এর পক্ষে বলেন, তাদের যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশি প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন 'বঙ্গবন্ধু আপনি যাই করেন সেটাই ভালো, যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সঠিক এবং যা বলেন, সেটাই শেষ কথা' ইত্যাদি। কাজেই পক্ষে বলাটা খুবই সহজ। কিন্তু এর মধ্যে নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ গোপনে আলাপ আলোচনা করে সাব্যস্ত করেন, বাকশাল কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যাবে না। সে হিসেবে সভায় জেনারেল ওসমানী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও নূরে আলম সিদ্দিকী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন।

সংসদীয় দলের বৈঠকের শেষ দিন, ২১ জানুয়ারি আমি বক্তৃতা করবো স্থির করলাম। আমি হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তার সামনের সোফায় উপবিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে সেরনিয়াবাত এবং ফরিদ গাজীর মাঝখানে আমাকে বসতে বললেন। সভার কাজ শুরু হওয়ার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আলোচনার সূত্রপাত করলেন এই বলে—"বঙ্গবন্ধু, আপনি সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেটা আসলে কী এবং কেন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা নিজ মুখে বুঝিয়ে বলুন। আপনি যা বলবেন তাই গৃহীত হবে এবং পরে তা আইনে পরিণত করা হবে।" এই বক্তব্যের পর বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, তিনি কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চান না। উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ আলোচনার মাধ্যমে যা স্থির করবেন সেটাই তিনি গ্রহণ করবেন। বঙ্গবন্ধু এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে এর উপর আলোচনা করার আহ্বান জানালেন। আমি তখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দাঁড়াই। আমার সামনে বঙ্গবন্ধু এবং চার সিনিয়র নেতা উপস্থিত। আমি কথা শুরু করার ক্ষণেই তিনি আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন, "যারা আমার বক্তব্য সমর্থন কর, তারা হাত উঠাও।" পলকের মধ্যে সভাস্থলে হাত উঠে গেলো। আড়ালে দু'চারজন হাত না তুললেও এমনভাবে বসেছিলেন, যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

অবশ্য সে সময় জেনারেল ওসমানী ও মইনুল হোসেন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবত, নূরে আলম সিদ্দিকীও অনুপস্থিত ছিলেন। আমি বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে হাত উঠানো হয়ে গেলো। তখন বঙ্গবন্ধু খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বললেন, "বস বস"। এ অবস্থায় আমি আর কি বক্তৃতা করবো। অগত্যা বসে পড়লাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে হাত তুলতে নির্দেশ দিলেন। আমি মাথা নেড়ে হাত তুলতে অস্বীকার করলাম। এখানেই সভার সমাপ্তি। সভায় জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

আমি আর চা খাওয়ার দিকে না গিয়ে মাগরেবের নামায এবং আমার বাসায় সাপ্তাহিক মিলাদে যোগ দেওয়ার জন্য চলে এলাম। আমার সঙ্গে চাঁদপুরের এমপিরা ছিলেন। গাড়িতে এসে বসার পর চোখে পানি এসে গেলো। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "আজ বঙ্গবন্ধু শেষ হয়ে গেলেন।" এই আকস্মিক অলুক্ষণে মন্তব্য, যা আমার মনের কথা ছিলো না, সেটা পরে কতোখানি সত্যে পরিণত হয়েছিলো, ইতিহাস তার সাক্ষী। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে এলাম। (পৃষ্ঠা ১৫৩ ও ১৫৪)

'৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও থেমে যায়। সংশোধনী অনুযায়ী সকল দল মিলে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি মাত্র দল থাকবে। একটি মাত্র দল ছাড়া দেশে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব না থাকায় স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। গোপন দলগুলো দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি চোরাগুপ্তা আক্রমণ বাড়িয়ে দেয়।

যা হোক, বাকশাল নিয়ে একটা মহা তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলো। চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ রব। কে কার আগে বাকশালের সদস্য হবে, তার প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খান ২৫ এপ্রিল বিবৃতি দিয়ে বাকশালে যোগ দিলেন এবং যারা ১৫ আগস্টের পর বাকশালের সমালোচনায় ছিলেন পঞ্চমুখ, এমন অনেকেই বাকশালের সদস্যপদ সংগ্রহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষের মিছিলের ঢলে এবং স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে চললো। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে পুষ্পস্তবক এবং মালার স্তূপ জমে গেলো। ভাবখানা এই, দেশ সঠিক পথনির্দেশ পেয়েছে উপযুক্ত নেতার সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

বাকশাল প্রশ্নে জেনারেল ওসমানী এবং মইনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এ দু'জন সৎ সাহস দেখিয়ে যে বিদ্রোহী ভূমিকা রেখেছেন, এতোখানি সাহস আমি দেখাতে পারিনি সেটা ঠিক। কারণ আগেই বলেছি। তারপরও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক, সেটাতে কোন ঘাটতি ছিলো না। এ সময় অনেকেই আমাকে এসে বলতো, বাকশাল এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন মিলে ২৪৫ জনের যে কমিটি হয়েছে কোথাও আপনার নাম দেখলাম না। এটা শ্রুতিমধুর ছিলো না। তবে এটা ঠিক, যে রাজনৈতিক দর্শনে আমি বিশ্বাস করি না, সেখানে সদস্য না থাকাটাকে আমি ভালোই মনে করেছি। (পৃষ্ঠা : ১৬১)

www.pathagar.com

মাওলানা ভাসানীর মন্তব্য

শেখ মুজিবের শাসনামলের প্রথমদিকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়া সরকারি ভ্রান্তনীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস আর কারো ছিলো না। তিনি হক কথা নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মুজিব সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন বলে পত্রিকাটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এ পত্রিকার বক্তব্যও লন্ডনে ফটোকপি করে বিলি করতে দেখেছি।

মুজিব সরকারের ভারতমুখিতা সম্পর্কে 'আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ ওয়াদা ভঙ্গের এক নজীর' নামক পুস্তিকায় মাওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে লিখেন ঃ

"পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি আমাদের আসে নাই, কেননা আগেকার প্রাদেশিক গভর্নর ও মন্ত্রীদের চাইতে অধিকতর নগ্নভাবে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে সপ্তায় সপ্তায় গমন করেন, সেখান হইতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় কিসিঞ্জার বাংলাদেশের অসরকারি প্রধানমন্ত্রী ডিপি ধর (হালে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত হাত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবুরা) আসিয়া যে নির্দেশ দিয়ে যান, ঠিক সেভাবেই দেশ চালানোর এস্তেমাল হইতেছে। বাংলাদেশের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দিল্লীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার নাম করিয়া অর্থমন্ত্রী নয়াদিল্লীর প্রভুদিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া দেখাইয়া আনেন। সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার হইলো, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জনগণের পবিত্র সনদ শাসনতন্ত্রটিও খসড়া হইবার পর জনগণের কাছে প্রকাশের আগে দিল্লী পাঠানো হইয়াছে। জুন মাসে (১৯৭২) আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন শাসনতন্ত্রের খসড়া বগলদাবা করিয়া বিলাত যাইবার নাম করিয়া দিল্লীর প্রভুদের খিদমতে হাজির হইয়াছেন। মৎস্য বিভাগ এমনকি সমবায়ের মতো অনুল্লেখযোগ্য দপ্তরের মন্ত্রীরাও এদেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ লইবার আগে নয়াদিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই দৌড়াইয়া ভারতীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নির্দেশ ও ফরমায়েশ লইয়া আসেন।"

জনাব আবুল আসাদের লেখা 'একশ বছরের রাজনীতি' গ্রন্থ থেকে (পৃষ্ঠা ৩০৯)

এডভোকেট সা'দ আহমদের 'আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল' গ্রন্থ থেকে ঃ

আর্মি অফিসারদের শেখ মুজিবের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে কয়েকজন যুব আর্মি অফিসার এমন এক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করেছিলো। ঢাকা লেডিজ ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মেজর ডালিম আর তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। শেখ সাহেবের ডান হাত ও রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই, মিসেস ডালিমের উপর কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে গাজীর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী যোগ দেয় এবং দম্পতিটিকে বেইজ্জতি করে। ঘটনা শুনে ডালিমের সহকর্মী আর্মি বন্ধুরা এর দাঁতভাঙা জবাব দেয়। দুই ট্রাক ভর্তি সৈন্য সামন্ত নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাংলো তছনছ করে। উভয়পক্ষ শেখ সাহেবের কাছে বিচার চাইলে তিনি মিলিটারি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেন এবং তার ফলশ্রুতিস্বরূপ ২২ জন যুবক আর্মি অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয় কিংবা জোরপূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

www.pathagar.com

এদের মধ্যে মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর হুদাও ছিলেন। এতে যুব অফিসারদের মধ্যে শেখ মুজিবের উপর দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার পরিণাম হয়েছিলো অত্যন্ত মারাত্মক। (বাংলাদেশের রক্তের ঋণ-এন্টনী ম্যাসকারেনহাস)

রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

মাওপন্থি সিরাজ শিকদার ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে পুলিশ কর্তৃক চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ পাহারায় তাকে ঢাকা এনে শেখ সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে আয়ত্তে আনতে চাইলেন, কিন্তু সিরাজ শিকদার কোন আপসে রাজি হলেন না। শেখ সাহেব পুলিশের হাতে তাকে দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন। সিরাজ শিকদারকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় রমনা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তারপর গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকারি প্রেস নোটে বলা হয় যে, 'পালানোর চেষ্টাকালে' সিরাজ শিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে বিচার বিভাগীয় একটি রায়ে রক্ষীবাহিনীর বর্বরতা এবং উদ্যাম ও বেপরোয়া নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের ঘটনাবলি জনসাধারণের দৃষ্টিতে আসে। ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার মাত্র ১৮ বছরের একটি তরুণ শাহজাহানকে পুলিশ ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলের নিকট থেকে গ্রেপ্তার করে রক্ষীবাহিনীর হাতে সমর্পণ করে। রক্ষীবাহিনীর শেরে বাংলানগরস্থ হেড কোয়ার্টারে তাকে ২/১/৭৪ পর্যন্ত রাখা হয়। তারপর সে লাপাত্তা হয়ে যায়। শাহজাহানের ভাই মহসীন শরীফ থানা পুলিশ কোর্ট ইত্যাদি সর্বমহলে শাহজাহানকে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন (৪৬/১৯৭৪) দায়ের করেন। রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করে বলা হয়, আসামি শাহজাহান তদন্ত অভিযানকালে তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আইনের আওতা বহির্ভূত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষীবাহিনীকে দোষী বলে চরম তিরস্কার করেন। সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পান যে রক্ষীবাহিনী কোন আইন-কানুন নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি কিছুই মেনে চলতো না। এমনকি গ্রেপ্তার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের কোন রেজিস্টারও তাদের ছিলো না। (২৭ ডি. এল. আর ১৮৬ বিচারপতি ডি.সি ভট্টাচার্য ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী) বিচার বিভাগীয় এসব রায়ে শেখ মুজিব আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ ঃ দুঃখজনক পরিণতি

প্রধানমন্ত্রিত্বের বিরাট দায়িত্বে থেকেও শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ কাটেনি। আরও বেশি ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নেবার পরিকল্পনায় মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্স/আমেরিকান কায়দায় রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রবর্তন করবেন এবং তাই করলেন। দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জনগণকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। নিজের কাজে যেন কোন বাধা না আসে তার জন্য বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করলেন। তারপর জাতীয় সংসদে তার সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে সকল আইন পাস করিয়ে নিলেন। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সকল পরিবর্তনে রাবার স্ট্যাম্প প্রদানের কাজ শেষ করলো। শেখ মুজিব এই পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যা দিলেন। তার মতে, "এ বিপ্লব শোষণ আর

www.pathagar.com

অন্যায় থেকে দুঃখী মানুষের মুক্তি বয়ে আনবে।" তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। বাংলাদেশের চাটুকার ও সরকারের করুণাভোগী বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রের কোনদিনই অভাব হয়নি। তারা খুশির চিৎকারে ফেটে পড়লো। লক্ষকোটি মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো চাটুকারদের আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য। করুণাভোগীদের সরকার-উচ্ছিষ্ট খাওয়ার পথ আরও সুগম হলো। এটা অবশ্যই দ্বিতীয় বিপ্লব বা কোন বিপ্লব ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো, "প্রাসাদ ষড়যন্ত্র," যা দেশ থেকে মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার আর গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করেছিলো।

এতেও মিটিলো না আশা। আরও ক্ষমতা চাই। শেখ মুজিব শুরু করলেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ক্ষমতা তার হাতে কুক্ষিগত করতে। ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে গেলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এই সংশোধনীর বদৌলতে শেখ মুজিব পার্লামেন্টের উপরও ক্ষমতাসীন হলেন, দেশে একনায়কত্ব কায়েম করলেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমেরও ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। ৭ জুন ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলেন। সকল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলো। বাকশালের সদস্য না হয়ে কারও পক্ষে কোন রাজনীতি করার সুযোগ আর রইলো না। (পৃষ্ঠা : ১৭৬ ও ১৭৭)

'মেজর জলিল রচনাবলি' থেকে মাসুদ মজুমদার কর্তৃক সংকলিত।

প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, মেজর, কমান্ডার, মেজর জলিল রচনাবলি থেকে উদ্ধৃত ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মূল্যায়ন যে কোন কারণেই হোক আজো সঠিক অর্থে করা হয়নি। জাতির অগ্রগতির জন্যই ১৫ আগস্টের সঠিক মূল্যায়ন করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যে শাসনকাল বিস্তৃত ছিলো, সে শাসনকাল সম্পর্কে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ও দল ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মানুষেরই প্রায় একই মন্তব্য এবং ধারণা। সে শাসনকালটি ছিলো চরম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিপূর্ণ, দুঃশাসনে ভরপুর একটি দুঃস্বপ্নের কাল। এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণসহকারে একটি রাজনৈতিক দল তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, আর সেনাবাহিনী থেকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী জনগণ ছাড়া ছুটে এসেছিলো সেই দুঃশাসন মুছে ফেলতে। সেদিন যে দলটি জনগণসহকারে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সব রকম ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের বীরত্ব জনগণের কাছে স্বীকৃত, জনগণের আকণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে সেদিনের সরকারবিরোধী নেতৃত্ব। কারণ সহজ, সেই দুঃশাসনের সম্মুখীন হওয়া সেদিন যার তার পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। আর তাছাড়া দেশের আপামর জনগণ সেদিন সেই যাতনামূলক দুঃশাসন থেকে প্রতিনিয়তই মুক্তি কামনা করতো। (পৃষ্ঠা : ৮৫)

কুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণকে সংগঠিত করে দেশবাসীর সামনে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

www.pathagar.com

নামে একটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক মহলকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করায় দলটির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মেজর জলিলের এ জনপ্রিয়তার কারণ ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার ফলে গোটা দেশের কর্তৃত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়। তারা প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বন্দি করে ভারতে নিয়ে যাবার সাথে সাথে পাকিস্তান বাহিনীর বিশাল সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রও ভারতে পাচার করতে থাকে। এমনকি ভারতের নিকটবর্তী এলাকা শিল্প নগরী খুলনা থেকে কল-কারখানার যন্ত্রপাতি পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেতে থাকে। মেজর আবদুল জলিল এ লুণ্ঠন ঠেকাতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর বিরাগভাজন হন। '৭১-এর ৩১ ডিসেম্বর সরকার তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম রাজবন্দি।

স্বৈরশাসনের ভয়ানক পরিকল্পনা

শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন যে, তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে যাচ্ছে, জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্থিরতা বেড়ে চলেছে এবং সকল রাজনৈতিক মহল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এ অবস্থায় রক্ষীবাহিনী ও তার দলীয় সশস্ত্র বাহিনীর লালঘোড়া দাবড়িয়েও তিনি গদি রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্টেলিনের মতো একনায়ক হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। মস্কোপন্থিরা তো তাকে ঘিরেই ছিলো।

এর প্রথম ধাপ হিসেবে বাকশাল গঠন করলেন। তার দলের নেতারা এতো বড় অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করলেন যে, তার মাথায় শাহান শাহ (বাদশাহের বাদশাহ) হবার নেশা চেপে বসলো। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে ৬১টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৬১ জন বাদশাহ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদেরকে গভর্নরের মহাউপাধিতে ভূষিত করলেন।

ইংরেজ শাসনামলে অবিভক্ত বঙ্গদেশে গভর্নরের শাসন ছিলো। '৪৭-এর পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পূর্বপাকিস্তানে গভর্নর নিয়োগ করা হতো। শেখ মুজিব তার বাদশাহী কায়েম করার প্রয়োজনে প্রতিটি মহকুমাকে এক-একজন গভর্নরের শাসনাধীন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করে তাদের তালিকাও ঘটা করে প্রকাশ করলেন।

সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রত্যেক গভর্নরকে তার এলাকায় এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করা হলো, যাতে প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহর মতো স্বেচ্ছাচারিতা করতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয়। এলাকার জন্য বরাদ্দ সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও রক্ষীবাহিনী গভর্নরের আজ্ঞাবহ থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া তাদেরকে আর কারো কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে না। ১৯৭৫

www.pathagar.com

সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এ রেজিমেন্টেড শাসনব্যবস্থা চালু হবার কথা ছিলো। রাশিয়ার আদলে এ জাতীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে গোটা বাংলাদেশ এক মহাকারাগারে পরিণত হতো এবং জনগণ শেখ মুজিব ও তার গভর্নরদের অসহায় প্রজার করুণ 'মর্যাদা' ভোগ করতে বাধ্য হতো।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, যে দলটি ২৫ বছর পর্যন্ত গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আন্দোলন করলো, সে দলের সকল নেতা ও বিপ্লবী কর্মীবাহিনী বাকশাল ও গভর্নর পদ্ধতির শাসনব্যবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে কেমন করে অন্ধভাবে মেনে নিলো? এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দলটি প্রকৃতিগতভাবেই ফ্যাসিস্ট এবং দলপ্রধান দলের সবাইকে এমন প্রশিক্ষণই দিয়েছেন। দলীয় নেতার অন্ধ আনুগত্য ও নির্লজ্জ চাটুকারিতা করাই এ দলের নীতি ও ঐতিহ্য।

আওয়ামী লীগের ২৯২ জন এমপি-র মধ্যে মাত্র দু'জন বাকশাল্ গঠনের প্রতিবাদে সংসদ থেকে প্রতিবাদ করার হিম্মত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা দু'জন শেখ মুজিবের নিকট প্রশিক্ষণ পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাদের একজন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানী। তিনি তো আওয়ামী লীগের ক্যাডারই নন। অপরজনও ঐ ক্যাডারভুক্ত ছিলেন না। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রখ্যাত সম্পাদক জনাব তাফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়ার যোগ্য সন্তান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। তিনি শেখ মুজিবের হাতে তৈরি লোক নন।

আওয়ামী লীগের তৈরি লোকদের চরিত্র

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তৈরি আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের চাটুকারী স্বভাব সম্পর্কে শেখ মুজিবের পরম ভক্তি ও অনুরক্ত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সময়ের বিশিষ্ট নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'রাজনীতির তিনকাল' থেকেই বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পেশ করছিঃ

"এখানে একটা মজার অথচ করুণ ঘটনা হলো, ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু যেদিন প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন, তার আগে শাহ মোয়াজ্জেমকে পাঠিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহর পদত্যাগপত্র আনিয়ে নেন। ওই সময় মোহাম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি হিসেবে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হলো। মোহাম্মদ উল্লাহকে বাকশাল মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী বানানো হলো। এ সময় দেখেছি, যারা বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপণ করতে প্রস্তুত, এ ধরনের অনেককেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অথবা নিজ প্রচেষ্টায় দেখা করে বাকশাল প্রবর্তনের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করছেন। সব মানুষই নিজের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে। প্রকাশ্যে যা কিছুই বলুন, ভেতরে ভেতরে প্রশংসা শুনে আনন্দ ও তৃপ্তি পান। মুখে দু'চারটি আপ্ত বাক্য যেমন– "আপনি বাড়িয়ে বলছেন, অথবা যতটুকু বলছেন ততোটুকু না"–এ ধরনের বিনয় করে থাকেন। ব্যাপারটি যদি ওখানেই শেষ হতো, তাহলে কথা ছিলো না। কিন্তু এটা যে শুধু প্রশংসাকারীকে চাটুকারে পরিণত করে তা-ই নয়; প্রশংসিত ব্যক্তির যে কি সর্বনাশ করা হলো তা তিনি উপলব্ধিও করতে পারেন

www.pathagar.com

না। প্রশংসা শুনতে শুনতে তিনি ভুলেই যান যে, তার কোন দোষ বা ত্রুটি থাকা সম্ভব। এই ভুলে যাওয়ার কারণে সে ব্যক্তির মধ্যে অহং ও দম্ভ বা আত্মম্ভরিতা অর্থাৎ ফার্সি ভাষায় 'হাম চুঁ দিগার নীস্ত' অর্থাৎ আমি সবার চেয়ে বড় বা আমার চেয়ে বড় কেউ নেই– এই মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে এক পর্যায়ে তাকে স্বৈরাচারী করে তোলে। নিজের অজান্তেই তিনি ক্রমে নিজের সৃষ্ট একটা বলয়ের মধ্যে একাকী হয়ে যান। এই একাকিত্ব তাকে দুঃসাহসী করে তোলে। সিদ্ধান্ত নিতে আবার এই চাটুকারদের পরামর্শই গ্রহণ করেন। একথা ভুলে যান যে, চাটুকার কেবল তার আপন স্বার্থেরই বন্ধু। (পৃষ্ঠা : ১৬২)

বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলে সারা দেশের নেতা-কর্মীরা ঢাকায় এসে ভিড় করলো, কিভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে নিজেদের স্থান করা যায়। সেই সাথে জেলা গভর্নর এবং সেক্রেটারি হওয়ার তদবিরে ঢাকা শহর এক তদবির-নগরীতে পরিণত হলো। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, বেসামরিক আমলা, সামরিক বাহিনীর শফিউল্লা, জিয়াউর রহমান, পুলিশ, বিডিআর, আনসার, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণী থেকে প্রতিনিধি এনে ২৪৫ জনের সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করা হলো। চারদিকে বাকশালের এই রমরমা ভাব, দলে দলে সবাই বাকশালে যোগদান করছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু একদিন বাকশাল সম্পাদকদের ট্রেনিং কোর্সেরও উদ্বোধন করলেন। এ সময় বাকশালের সাধারণ সম্পাদক মনসুর ভাই ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে ঘুরে বাকশাল কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়ে ফিরছিলেন।" (পৃষ্ঠা : ১৬২)

শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি

বাকশাল কায়েম হবার পর সকল রাজনৈতিক দলই বেআইনী হয়ে গেলো। শেখ মুজিবের বিরোধী বলিষ্ঠ কণ্ঠ মেজর জলিল ও জাসদের নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। রাজনৈতিক ময়দানে বাকশালের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করার মতো কোন মহল অবশিষ্ট রইলো না। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভাষা-আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি ও বাকশাল প্রধান কর্তৃক এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে নতুন শাসনব্যবস্থার সরকারি ঘোষণা উচ্চারণের আয়োজন সম্পন্ন করা হলো। ঐ ঘোষণার পরপরই ৬১ জন গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবার কথা।

এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে কর্মরত কতক মুক্তিযোদ্ধা জনগণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুক্তির আর কোন বিকল্প উপায় ছিলো না। তারা উপলব্ধি করলেন যে, ১৫ আগস্ট নতুন রেজিমেন্টেড শাসনব্যবস্থা চালু হয়ে যাবার আগেই স্বৈরশাসকের পতন অপরিহার্য। তাই তারা ১৪ আগস্ট দিবাগত শেষ রাতেই শেখ মুজিবকে হত্যা করার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নদীর পানি প্রবাহিত হবার স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দিলে পানি স্ফীত হয়ে এক সময় নিজের পথ অবশ্যই করে নেয়। রাজনৈতিক ময়দানেও মতপ্রকাশের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করলে অস্বাভাবিক পন্থায় তা প্রকাশ পাবেই। শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন এর কোন রাজনৈতিক প্রতিকারের পথ থাকলে সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

কোন ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হতো না। এ ঘটনা সম্পর্কে মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিনকাল' গ্রন্থের বিবরণ ঃ

"১৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমার বিশিষ্ট বন্ধু আবদুল মতিন চৌধুরী ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানালেন। সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে আমাকে বঙ্গবন্ধুর পৌঁছার অন্তত এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। টেলিফোনে বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনে তাস খেলায় বসি। রাত প্রায় একটার দিকে ঘুমাতে গেলেও ঘুম আসছিলো না। রাত তখন ক'টা হবে মনে নেই, হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে ডাকলেন। তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরতে বললেন। মাত্র ঘুম আসছিলো, এর মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে উঠে টেলিফোন ধরি। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মাওলানা মান্নান খবর দিলেন, ঘটনা ঘটে গেছে। ৩২ নম্বরে গোলাগুলি হচ্ছে। আমিও তখন আমার ইস্কাটনের বাসা থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনছিলাম। তখন সম্ভবত সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় আক্রমণ চলছিলো। এরই মধ্যে কিছু পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠে। মাওলানা মান্নান বললেন, 'রেডিও ধরেন'। রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বরে ইতিহাসের জঘন্যতম নিষ্ঠুর ঘটনার ঘোষণা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। ডালিম রেডিওতে সদম্ভে ঘোষণা করে চলেছে, "স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।" সূর্যের ধরণীতলে পতনের মতো এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। এও কি সম্ভব! এও কি হয়! কার এমন সাহস, কার এমন বুকের পাটা, যার আবির্ভাব না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না, সমগ্র জাতি যাকে মাথার মুকুট করে রেখেছে, হিমালয় সমান সেই মহীরুহকে কারা হত্যা করলো?" (পৃষ্ঠা : ১৬৫)

মুজিব হত্যা সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ রচিত 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫' গ্রন্থ থেকে ঃ

১৫ আগস্ট ('৭৫) এবং ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন

এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও অমানিশার অবসান ঘটে বাংলা-মায়ের সাতটি সন্তানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। মৃত্যুঘণ্টা বাজে মুজিবী জালেমশাহীর। উদয় হয় অরুণরাঙ্গা প্রভাত। অকুতোভয় এই সাতটি দামাল সন্তান যেন বাংলাদেশের সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এক এক কোটির প্রতিনিধি যেন এক-এক জন। ইহারা হইতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাতজন অফিসার ঃ লেঃ কর্নেল রশীদ, লেঃ কঃ ফারুক, মেজর পাশা, মেজর হুদা, মেজর মহিউদ্দীন এবং পদচ্যুত মেজর ডালিম ও মেজর শাহরিয়ার। সেদিন যেমন আপামর বাঙালি জনতা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাভরে হৃদয়-নিংড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইয়াছিল, তেমনি স্বাধীনচেতা বাঙালিমাত্রই চিরকাল এই সাতজন তরুণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইবে। বস্তুতঃ জাতীয় নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতা ও বিজাতীয় দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাওয়ার সূর্য সম্ভাবনা হিসাবেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট চিরকাল পরিগণিত হইবে। আজাদী-পাগল বাঙালির জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ১৫ আগস্ট সত্যিই এক অনন্য দিবস। ইহা ছিল কার্যতঃ দিল্লী ও দিল্লীর দাসদের অশুভ শৃঙ্খল মোচনের প্রথম পদক্ষেপ ও শুভ সূচনা।

www.pathagar.com

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) খন্দকার মুশতাক আহমদ অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনের অগ্রদূতদের অনুরোধে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং জাতীয় জীবনের সেই ঝঞ্ঝাসংকুল উত্তাল তরঙ্গে শক্ত ও সুনিপুণ হস্তে রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল ধরেন। অভ্যুত্থানের মূল সুরকে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও জনজীবনে রূপদানের মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৭৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা এক দলীয় রাজনীতি আইন বাতিল করেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৮ আগস্ট বাতিল করেন একষট্টিটি জেলার গভর্নর নিযুক্তি আদেশ। ২২ আগস্ট (১৯৭৫) এক প্রশাসনিক আদেশে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতঃ মূল মালিকের নিকট হস্তান্তর করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২২ আগস্টেই তিনি রাষ্ট্রপতি আদেশ ৯ (পি. ও. ৯) বাতিল করেন ও সরকারি কর্মচারীদের মনে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সর্বোপরি ৩ অক্টোবরের বেতার ভাষণে তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৫ আগস্ট (১৯৭৬) হইতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হইবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৭) তারিখে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, সকল রাজবন্দির বিনা শর্তে মুক্তি প্রদানও করা হইবে এবং অতঃপর রাজনৈতিক কারণে কাহারো বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইবে না। এভাবেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন, বহুদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নব অধ্যায় সূচিত হয় খন্দকার মুশতাক আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সিদ্ধান্তে।" (পৃষ্ঠা : ৫৬৮-৫৬৯)

বিদেশীদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের পতনের কারণ

প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদ রচিত 'একশ' বছরের রাজনীতি' থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

"বস্তুত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রবাদী ও ভারতঘেঁষা রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্বের পতন ঘটলো। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব তার পরিবারবর্গসহ মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার একদিন পর একজন বিদেশী সাংবাদিক লিখেছিলেন, "তার (মুজিবের) বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করতেন। ..... সামরিক অফিসারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন। ..... মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রে-শস্ত্রে, বেতনে-ভাতায়, ব্যয়ে-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।..... মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবনমন অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে। 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম-পাকিস্তানিদের

www.pathagar.com

চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিলো। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমুআর নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে। [এন্থনী মাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫]

শাসনতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষমুখী পরিবর্তন শেখ মুজিবের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়, আরও অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষক একথা বলেছেন। শেখ মুজিব নিহত হবার পরপরই লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ লিখে ঃ "বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিলো, ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।" [অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫]

"১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই।..... শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিলো। মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস যে, পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায় যে, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাজ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিলো।.... তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিলো।..... আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থি মুসলমান বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।" [গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৩০৫-৩০৬)

আগস্ট-বিপ্লবের সুফল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বৈরশাসকের পতনের সুফল সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ রচিত 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থে বর্ণিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মুশতাক আহমদ যেসব পদক্ষেপ নেন তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মনঃপূত হওয়ার কথা নয়। সেদিকে ইঙ্গিত করে জনাব অলি আহাদ ঐ গ্রন্থেই লিখেন ঃ

"খন্দকার মুশতাকের এই দৃঢ়তা দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধীর সকল কারসাজিকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয় তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্য ও ঈমানের মন্ত্রে দীক্ষিত সাত কোটি বঙ্গ সন্তান অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত জাতীয় জীবনের সকল অমূলক, অকল্যাণ ও অশুভ প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মুছিয়া ফেলিতেও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনের

www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ এই কল্যাণ প্রয়াস বহির্বিশ্বেও সমভাবে অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ সুফল, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ও তৃতীয় বিশ্বশক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ. এন. লাই ৩০ আগস্ট (১৯৭৫) তাঁহার বার্তায় বলিয়াছেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের পক্ষ হইতে সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে, চীন সরকার আজ হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।" উল্লেখ্য যে, চীনের অভিযোগ ছিলো, শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার দিল্লীর পুতুলমাত্র এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। তাই মুজিব আমলে অনবরত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। এদিকে আরব জাহানের তথা মুসলিম জাহানের মধ্যমণি সউদী আরবও একই কারণে দিল্লীর দাস মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া আসতেছিলো। কিন্তু খন্দকার মুশতাক আহমদ দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই ১৬ আগস্ট সউদী আরবের বাদশাহ খালেদ বাংলাদেশকে কেবল স্বীকৃতিই দেন নাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে সউদী আরবের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন। স্বল্পতম সময়ের জন্য হইলেও খন্দকার মুশতাক আহমদের এই দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশকে দিল্লীর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার ব্যাপারে তাহার আন্তরিক ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।" (পৃষ্ঠা : ৫৭০)

আগস্ট-বিপ্লবের সুফল সম্পর্কে জনাব আবুল আসাদ 'একশ' বছরের রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"আগস্ট-বিপ্লবের পর দেশের রাজনীতি আবার স্বাধীন ও জাতীয় চেতনায় ফিরে এলো। শাসনতন্ত্রের মৌল ভিত্তির আসন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বিদায় করা হলো এবং তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হলো 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। আর শাসনতন্ত্রের শুরু করা হলো আল্লাহর নাম নিয়ে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে। ধর্মীয় নামে অর্থাৎ 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার উপর যে বিধি-নিষেধ শাসনতন্ত্রে ছিলো, তার বিলোপ সাধন করা হলো। এছাড়া শাসনতন্ত্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থার যে বিধান ছিলো, তাও উচ্ছেদ সাধন হয়ে গেলো।

এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতি অসহনীয় ও অশরীরী এক বন্দিদশার হাত থেকে মুক্তি পেলো, অনুভব করলো স্বাধীনতার স্বাদ। সংবাদপত্র থেকে রাজনীতি, শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই একটা শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে এলো। বিলোপ ঘোষিত সংবাদপত্রগুলো আত্মপ্রকাশ করলো, রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি পেলো। সবচেয়ে বড় কথা হলো ধর্মভিত্তিক দলগুলো সাড়ে তিন বছরের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করলো। প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে পারলো জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইত্যাদিসহ ইসলাম ও মুসলিম নাম পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক দল।

এইভাবে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশে যে মুসলিম রাজনীতির নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যে রাজনীতির দান মুসলিম আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ভূখণ্ড,

www.pathagar.com

সেই রাজনীতি আবার ফিরে এলো বাংলাদেশে। অন্যকথায় বাংলাদেশ ফিরে এলো তার স্বরূপে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-বিপ্লবের ঘোষণাকালে বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু এই ঘোষণাকে পরে রক্ষা করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দেশ শাসন করেছে। এ দুটি দল ধর্মনিরপেক্ষ নয়, শাসনতন্ত্রের মতোই এ দুটি দল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাখে এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণের কথা বলে, তবু বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিক হয়নি কিংবা সরকারের আইন ও আচরণের উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ হয়নি। অবশ্য জাতীয় পার্টির শাসনামলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে 'ইসলাম'-কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' এবং বাংলাদেশের রাজনীতি নীতিগতভাবে ইসলামভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ এখনও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিও ইসলামভিত্তিক হয়নি।" (পৃষ্ঠা : ৩০৬-৩০৭)

১৯৭৫-এর সামরিক বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে সেনাবাহিনীর কতক কর্নেল ও মেজর শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে অসহায় দেশবাসীকে মুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে কোন বিকল্প পথ না থাকায় বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করেন। এ ধরনের হত্যাকে মিলিটারি ক্যু বা সামরিক বিপ্লব বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের বহু দেশে সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কোথাও বিপ্লব সফল না হলে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী হিসেবে শাস্তি পেয়েছে।

সফল সামরিক বিপ্লব মানে বিপ্লবীদের বিজয়। যদি সামরিক বাহিনীর অনুগত অংশ বিপ্লব ঠেকাতে ব্যর্থ হয় এবং বিপ্লবীরা বিনাবাধায় সরকার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় তাহলে বুঝা গেলো বিপ্লব সফল হয়েছে। যদি জনগণ এ পরিবর্তনে সন্তুষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে এটাকে পরম সাফল্য বলা চলে।

বাংলাদেশের আগস্ট-বিপ্লবকে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিপ্লব হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ ঃ

১. বিপ্লবীগণ খন্দকার মুশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানালে তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে, তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের আনুগত্য চাই। তারা বিনা প্রতিবাদে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। অথচ তারা সবাই শেখ মুজিবের নিয়োগকৃত ছিলেন।

২. শেখ মুজিবের গদিরক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীবাহিনী প্রতিরোধের সামান্য চেষ্টাও করেনি। এ বাহিনী প্রধান শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত সহচর জনাব তোফায়েল আহমদ রক্ষী-বাহিনীকে দিয়ে বিপ্লব ঠেকাবার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

৩. প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে কর্মরত সবাই বিপ্লবোত্তর সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করায় দ্রুত আইন-শৃঙ্খলায় উন্নতি হয়।

৪. সর্বস্তরে জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। অদ্ভুত এক জাদুর পরশে যেন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিস্ময়করভাবে শান্ত ভাব ধারণ করলো।

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত লোকেরা পরবর্তী পরিস্থিতিকে অনুকূল মনে করায় দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা দেখা গেলো।

ঐ সময় আমি তো দেশে ছিলাম না। আমি লন্ডনে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় সবাইকে দেশের ব্যাপারে নিরুদ্বেগই পেয়েছি। দেশের পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত বোধ করেছি। লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিরূপ রিপোর্ট দেখিনি। তাই আগস্ট-বিপ্লবকে অত্যন্ত সফল বিপ্লব বলে স্বীকার করতেই হয়।

মুজিব হত্যার বিচার

শেখ হাসিনার পিতা-মাতা ও ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বেদনাবোধ করাই স্বাভাবিক। এ দিক দিয়ে তার প্রতি সবারই সহানুভূতি বোধ করা উচিত। এটা অবশ্য মানবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা তাকে হত্যা করেছেন তারা তাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য তা করেননি। ইতিহাস সাক্ষী এবং বর্তমানে যাদের বয়স ৪০ এর বেশি এমন কোটি কোটি বাংলাদেশী দেশে ও বিদেশে সাক্ষ্য দেবার জন্য বেঁচে আছে যে, শেখ মুজিবের পতন দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিলো। তার কুশাসন থেকে জনগণের মুক্তির আর কোন বিকল্প উপায় ছিলো না। এটাকে সাধারণ হত্যা মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক।

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য আপন ভাইকেও হত্যা করে থাকে। নিজের স্ত্রীকেও যৌতুকের লোভে হত্যা করে। রাজনৈতিক স্বার্থেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে পারে। এ জাতীয় সকল হত্যারই বিচার হওয়া উচিত বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

দেশ ও জাতির স্বার্থে যখন সফল বিপ্লবের মাধ্যমে কোন সরকারের পতন হয় তখন হত্যাকাণ্ড ঘটেই থাকে। বিপ্লব সফল না হলে তো বিপ্লবীরা ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক দুশমন হিসেবে কঠোর পরিণতিই ভোগ করে থাকে। কিন্তু বিশ্বের কোথাও কোন সফল বিপ্লবের কারণে হত্যার জন্য বিচার হয় না। কারণ বিপ্লবীরাই সফল বিপ্লবের পর ক্ষমতাসীন থাকে। তাই তাদের বিচার করবে কে?

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পাওয়ায় তিনি মুজিব হত্যার বিচার করার জন্য হিংস্র মূর্তি ধারণ করেন। অথচ তার গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও তার পিতার হত্যার বিচার দাবি জানাননি। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এবং ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় লিডার হিসেবে মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি। তিনি জানতেন যে, জনগণ এ দাবিকে সমর্থন করবে না।

www.pathagar.com

মুজিব হত্যা যদি সত্যিকার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তখনকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও জনাব কাদের সিদ্দিকী ছাড়া দলীয় সকল এম.পি-র বিচার হওয়া প্রয়োজন। কারণ তারা হত্যার কোন প্রতিবাদ করেননি। মুজিব হত্যার পর দেশবাসী যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছে তাতে জনগণের পাইকারি শাস্তি হওয়া উচিত। বিশেষ করে যারা প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তারা তো অবশ্যই অপরাধী। আর খন্দকার মুশতাক আহমদের ২১ সদস্যের মন্ত্রিসভার মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য। বাকী ৫ জনও আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা ছিলেন।

খন্দকার মুশতাক আহমেদের মন্ত্রিসভা

মন্ত্রী ১০ জন ঃ ১. আবু সাঈদ চৌধুরী (পররাষ্ট্রমন্ত্রী), ২. অধ্যাপক ইউসুফ আলী (পরিকল্পনা মন্ত্রী), ৩. ফণীভূষণ মজুমদার (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী), ৪. সোহরাব হোসেন (পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী), ৫. আবদুল মান্নান (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী), ৬. মনোরঞ্জন ধর (আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচার মন্ত্রী), ৭. আবদুল মমিন (কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী), ৮. আসাদুজ্জামান খান (বন্দর, জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ জলযান মন্ত্রী) ৯. ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (অর্থ মন্ত্রী), ১০. ড. মোজাফফর আহমদ (শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি গবেষণা ও আণবিক শক্তিমন্ত্রী)।

প্রতিমন্ত্রী ১১ জন ঃ ১. দেওয়ান ফরিদ গাজী (বাণিজ্য, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ), ২. মোমেন উদ্দিন আহমেদ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ), ৩. প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী ৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিমান পর্যটন, ভূমি প্রশাসন ও সংস্কার), ৫. তাহের উদ্দিন ঠাকুর (ইনফরমেশন, ব্রডকাস্টিং, লেবার, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, কালকচারাল অ্যাফেয়ার্স ও স্পোর্টস), ৬. মোসলেম উদ্দীন খান (পাট), ৭. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (যোগাযোগ ও রেলওয়ে), ৮. কে. এম. ওবায়দুর রহমান (ডাক, তার ও টেলিফোন), ৯. ডা. ক্ষীতিশচন্দ্র মণ্ডল (সাহায্য ও পুনর্বাসন), ১০. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (ভোলা মিয়া) (বন, মৎস্য ও পশু), ১১. সৈয়দ আলতাফ হোসেন (সড়ক, জনপথ ও রোডস ট্রান্সপোর্ট)।

শেখ হাসিনার ভুল হিসাব

শেখ মুজিব অবশ্যই শেখ হাসিনার শ্রদ্ধাভাজন পিতা। কিন্তু তিনি জোর করে তাকে জাতির পিতা বানাবার চেষ্টা করে তার সম্মান হানি করেছেন। ১৫ আগস্টকে সরকারি দাপটে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন। অথচ তিনি ভালো করেই জানেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশবাসী শোক প্রকাশের পরিবর্তে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করেছে। জাতি যদি শেখ মুজিবকে সত্যিই পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো তাহলে পিতার মৃত্যুতে উল্লসিত হতো না। ভক্তি-শ্রদ্ধা জোর করে আদায় করা যায় না। এমন চেষ্টা করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

মুজিব হত্যার বিচার চলাকালে বিচারপতিগণ বারবার বিব্রতবোধ করায় কয়েকবার বেঞ্চ্ পরিবর্তন করতে হয়। সন্ত্রাসী কায়দায় আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারপতিগণের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করে বিশ্বে বিরল কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী শাসনামলে মুজিব হত্যা মামলাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছাবার পর মামলা স্থবির অবস্থায় পড়ে আছে।

মুজিব হত্যার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনা মাথায় ইহরামের রুমাল বেঁধে এবং হাতে তাসবীহ নিয়ে সারা দেশে নির্বাচনী অভিযান চালান। তার পিতার কুশাসনের জন্য দু'হাত জোড় করে জনগণের নিকট বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে জনগণের দরবারে আকুল আবেদন জানিয়ে একবারের জন্য খিদমতের সুযোগ দাবি করেন।

ঐ সময় ভোটার তালিকায় তাদের সংখ্যায়ই বেশি ছিলো, যারা শেখ মুজিবের কুশাসন নিজের চোখে দেখেনি। জাতীয় সংসদে আশাতীত সংখ্যক আসন লাভ করে শেখ হাসিনা ধারণা করলেন যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তিনি হয়তো ধারণা করলেন যে, মুজিব হত্যার সময় উল্লসিত জনগণের পরবর্তী প্রজন্ম জাতির পিতা হিসেবে তার পিতাকে সহজেই গ্রহণ করবে।

এ ভুল হিসাব করেই তিনি ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সরকারি ছুটি বাতিল করে দেন এবং ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে সরকারি ছুটি পালন করেন।

২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পর ৭ নভেম্বর আবার সঠিক মর্যাদায় ফিরে এলো এবং ১৫ আগস্ট জনগণের উল্লাস দিবসে পরিণত হলো। আওয়ামী লীগের বাইরে কোন মহল থেকে এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে তার পিতার ছবি টাকার নোটে ও সারা দেশে লাগিয়ে দিলেন এবং বহু সেতু, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানে তার পিতার নাম ঝুলিয়ে দিলেন। তার পিতাকে জনগণ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। কিন্তু জাতিকে পিতা বলে স্বীকার করাতে সক্ষম হননি।

সব ভালো যার শেষ ভালো তার

যদি কেউ শেষ জীবনে প্রশংসনীয় চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী সময়ে যত নিন্দনীয় কাজই করে থাকুক, মানুষ সে কথা ভুলে যায় এবং পরবর্তী জীবনের সুখ্যাতি করতে কার্পণ্য করে না।

এর বিপরীত উদাহরণেরও অভাব নেই। এক সময়ে সবাই যার প্রশংসা করে পরবর্তী জীবনে যদি সে নিন্দনীয় চরিত্রের পরিচয় দেয় তাহলে মানুষ তার পূর্বের প্রশংসা ভুলে যায় এবং শেষ দিকে নিন্দাবাদ নিয়েই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয়।

বিশ্বজনীন এ নীতি অনুযায়ী শেখ মুজিবের জীবনকে বিবেচনা করলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন চরম কলঙ্কময়। তাই ১৯৬৯ থেকে '৭২ সাল পর্যন্ত তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও '৭৫-এর আগস্টে তিনি যখন নিহত হন তখন মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জনগণের নয়নের মণি। অথচ শেষ পর্যন্ত চরম স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র

www.pathagar.com

হত্যাকারী, জনগণের সকল অধিকার হরণকারী ও দুর্নীতির লালনকারী হিসেবে গণমানুষের ধিক্কার ও অভিশাপ বহন করে অপমানজনক-অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হন।

আওয়ামী লীগ মহল ছাড়া আর কোন মহলেই শেখ মুজিবের গৌরবময় সময়ের কোন চর্চা অবশিষ্ট নেই। সর্ব মহলেই তার জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায় ব্যাপকভাবে আলোচিত। তার পরম ভক্ত ও অনুরক্ত জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী তার রচিত 'রাজনীতির তিন কাল' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিবের অতি ঘনিষ্ঠজনেরাও তার নিহত হওয়ার পর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করার পরিবর্তে চরম বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী খন্দকার মুশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। মিজান চৌধুরীর ভাষায় ঃ

"স্বার্থপরতার রাজনীতির কী বিচিত্র রূপ! কয়দিন আগে বঙ্গবন্ধুর কাছে ধরনা দিয়ে যিনি বাকশালের সদস্যপদ নিলেন, সেই আতাউর রহমান খান ঘটনার পরপরই ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল সে সময় বিদেশে ছিলেন। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, জাতি ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এমনকি বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীতে বাকশালের চেয়ারম্যান) মুশতাকের একটি ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আদায়ের জন্য মস্কো পর্যন্ত গিয়েছিলেন!

যা হোক, সামরিক শাসন জারি করার পর মোহাম্মদ উল্লাহকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রীকে পুর্নবহাল করে মুশতাকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করা হয়। একই দিনে পাকিস্তান মুশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতির জনকের মৃতদেহ তার ধানমণ্ডির বাড়ির সিঁড়িতে পড়ে থাকে। পরদিন টুঙ্গিপাড়ায় অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হেলিকপ্টারে তার মৃতদেহের সঙ্গে যে ক'জন সৈন্য যায়, তারা এবং স্থানীয় অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী মিলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যূহ সৃষ্টি করে অত্যন্ত দায়সারাভাবে তার জানাযা আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং তার কবরের প্রহরায় পুলিশ নিযুক্ত করা হয়। (পৃষ্ঠা : ১৬৮-১৬৯)

শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে বিদেশী কলামিস্টদের মন্তব্য

শেখ মুজিবের হত্যার পর বিদেশী পত্র-পত্রিকায় কলামিস্ট ও সম্পাদকদের মন্তব্য পত্রিকার নাম ও প্রকাশনার তারিখসহ হাফিয মাওলানা মুনীরুদ্দীন আহমদ 'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর' নামে ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত এ গ্রন্থটির শেষ দিকে 'বিদেশী পত্র-পত্রিকার মতামত' শিরোনামে ৫৭৯ থেকে ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ পৃষ্ঠায় বহু নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ সব লেখার সবটুকু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় বলে অল্প কিছু পরিবেশন করছি ঃ

মুজিব নিজেই দায়ী —*মার্টিন উলাকট*

"মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার

www.pathagar.com

উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিলো, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোন সংস্কার সাধনে, এমনকি একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য তার শেষ পদক্ষেপই তার পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থি আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজছিলেন। তাতে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মস্কোপন্থি দলগুলো উৎসাহ যুগিয়েছিলো।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যত এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হলো, এমনকি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষিত হলো।

মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মত অফিসে-দরবারে বসতেন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তার নতুন মন্ত্রিসভায় পুরান মন্ত্রীরাই ছিলেন।

আগেই বিরোধীদলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবত তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

এসব মন্ত্রীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন।

খন্দকার ডানপন্থি বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দীনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়তো তিনি ছবক নিয়েছিলেন।

তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিলো। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থি রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থি মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।

সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিলো।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিলো। এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে দেরাদুনে যেতো। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিলো। লক্ষ্য ছিলো আরও অনেক বেশি।

যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।"

[গার্ডিয়ান, লন্ডন, আগস্ট ১৬, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৬৩-৬৬৫)

অবশ্যম্ভাবী পতন —*কেভিন রেফার্টি*

"বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাউল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিলো। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙালি না খেয়ে মরেছে, তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অংক কামাই করেছে, রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে।

চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন না; বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ বেশিরভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিলো। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে।

নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মতো সৎ-সাহস শেখ মুজিবের কোন দিনই ছিলো না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের ভিড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলো। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলো।

মুজিব তোষামোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারের দল সযত্নে তার কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখতো। সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘন ঘন ছাপাবার জন্য।

স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তার ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগিনা শেখ মণিকে গড়ে তুলছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তার একটি হলো শেখ মণির পত্রিকা।

www.pathagar.com

কার্যত মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়লো। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো। কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশি দুর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পদে পদে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভীত গড়ে তোলা হচ্ছে দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।" [ফিনান্সিয়াল টাইমস, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫]

কিসে ভুল হলো? *—এন্থনি মাসকারেনহাস*

"১৯৭২ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তার সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হলো?

মুজিবের ট্র্যাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতর মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ-দুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন-ভাতায়, ব্যয়-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।

মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম-পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে, বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিলো।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিলো। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিয়ে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবরা তার চারদিকে এমন বেষ্টনী গড়ে তুলেছিলো, যার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন সংযোগ ছিলো না।

স্পষ্টতই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছলো, যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলত ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই তা করা হয়েছিলো। বাংলার মানুষ, যারা তিনপুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিলো। এতদসত্ত্বেও মুজিব তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত ছিলেন।

পরিহাস এই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তার কথাই ছিলো দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতির জনককে সরল মনেই দান করেছিলো। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তারা বিদ্রোহ করলো। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার উপর আঘাত আসলো। আর কোন পথ ছিলো না, মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হতো।" [সানডে, টাইমস, লন্ডন, আগস্ট, ১৭, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৬৬-৬৭১)

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে —*অমিত রায়*

"বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিলো, ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।

সমস্যার মোকাবিলা না করে মুজিব গুণ্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তার বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিঙ্গিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিলো। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগলো তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

www.pathagar.com

মুজিবের এসব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেন গাজী গোলাম মোস্তফা, যিনি 'বাংলাদেশের বড় চোর' বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ দুঃস্থজনের জন্য রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়েছে, আর বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান হিসেবে গাজী গোলাম মোস্তফা এসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বানিয়েছেন।

মোস্তফাকে রেশন-বণ্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিলো। রেশন দোকানের মালিকরা তারই প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে রেশনের খাদ্যসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি করে দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং এ কালো টাকার মোটা অংশ তারা নজরানা হিসেবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসেবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ি বিলি-বন্দোবস্তও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপরও তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন আইনের ঊর্ধ্বে।

ব্যাংক-এ ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ গুলী ছুঁড়লো। দেখা গেলো, স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল আহতদের মধ্যে অন্যতম।

বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবূ নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা-কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তার চেয়ে বেশিবার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ২৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।" [সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, আগস্ট ১৭, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭১-৬৭২)

স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী —*লুই সিমনস্*

"বাংলার জ্বলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে"— গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়তো স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেননি।

হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়; সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতোদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।

যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লী-মস্কোর সাথে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলো।

অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম-পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে, তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।

www.pathagar.com

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সংঘর্ষ মিসেস গান্ধীকে তার বিবদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিলো। সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয় মাস বাঙালি গেরিলারা সক্রিয় ছিলো বটে; কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে।" [ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭৩)

শেখের ট্রাজেডি —*হার্ভে স্টকউইন*

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর আসে, শেখ মুজিব ছিলেন তারই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তার দীপ্ত পদচারণার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেলো। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মতো সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, নিঃসহায় করে। তার আমলে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনি শুরু হতে পারে।

মূলত শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি ঘটনাবলির পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণতিতে বিক্ষোভকারীর মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

শেখের মধ্যে তার গুরু সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য ছিলো না। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী পৃথক বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪ বছর পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারা জীবন নেতিবাচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেবার সামর্থ্য তার হলো না। এ রায় কর্কশ শোনাবে। হয়তো আংশিকভাবে এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয় ১৯৫৭ সালে যখন এক কাঁদানে গ্যাসসিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তিনি তখন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন)। আওয়ামী লীগের মোকাবিলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিলো। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জি. এম. সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসলেন খান আবদুল গফফার খান। ন্যাপের অপর একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ভাসানী। ভাসানীকে শেখ মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন। কেননা ভাসানীই ছিলেন তার একমাত্র সমতুল্য গণবক্তা।

সকলেরই জানা ছিলো যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পণ্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন এবং ঠিকই, যেই মাত্র ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগলো, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগলো।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দিলো। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা কার্যত পূরণ করার সামর্থ্য তার ছিলো না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং এ বছরের জানুয়ারি

www.pathagar.com

মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যত সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিলো।

শেখ কেন কিছুই করতে পারলো না, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ প্রথমত, ক্ষমতা সম্পর্কে তার অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিলো। দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে একটা গভীর হীনম্মন্যতার ভাব (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ছিলো, যা আংশিকভাবে তার শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত, শেখ কখনোই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। এর ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিলো। কোন পক্ষই তা দূর করার চেষ্টা করেননি। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিলো শেখের, যেহেতু তার বিপুল জনসমর্থন। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিলো বুদ্ধিজীবীদের, কেননা একটা দেশের সমূহ সমস্যাবলি মোকাবিলা করার সাধ্য তার ছিলো না। [ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিয়ু, আগস্ট ২৯, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭৪-৬৭৭)

বিদেশী বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকায় সম্পাদক ও কলামিস্টদের লেখা থেকে শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে তাদের মতামত ও মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুজিব হত্যা মোটেই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক ছিলো না। এ করুণ পরিণতির জন্য শেখ মুজিব স্বয়ং দায়ী। সামরিক বিপ্লব ছাড়া শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আর কোন পথই ছিলো না। ঐসব লেখা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তারা ঐ বিপ্লবকে একটি সফল বিপ্লব হিসেবেই গণ্য করেন। সর্বস্তরের জনগণ ঐ পট-পরিবর্তনকে তাদের জন্য কল্যাণকর হিসেবেই স্বাগত জানিয়েছে। তাই মুজিব হত্যা বিচারযোগ্য কোন অপরাধ ছিলো না।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ স্বীয় নেতৃত্বে ১৫ আগস্টের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে প্রতি-বিপ্লব ঘটাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালান তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, সেনাবাহিনীর সিপাহীগণ ও জনগণ তা মোটেই সমর্থন করেনি। তখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ব্রিগেডিয়ার খালেদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে এমন এক অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেন, যার পরিণতিতে তিনি নিজেও নিহত হন এবং আরও অনেক অফিসার সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারান।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সামরিক বিপ্লব ঘটাবার প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করার আগে এ সম্পর্কে তার সমর্থক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'রাজনীতির তিন কাল' থেকে তার বিবরণ প্রথমে উদ্ধৃত করছি ঃ

"এদিকে বঙ্গভবনে অবস্থানকারী ১৫ আগস্টের খুনি মেজর চক্রের লাগামহীন খবরদারিতে ক্যান্টনমেন্টে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একদল অফিসার সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। কিন্তু নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ছিলেন ফারুক-রশীদদের অত্যন্ত আস্থাভাজন। তাছাড়া এই

www.pathagar.com

চক্রের কাছে স্বয়ং মুশতাক ছিলেন বাধা। ফলে জিয়াউর রহমানও দাবি অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন না। খালেদ মোশাররফের গ্রুপ বলতে লাগলো, কয়েকজন অফিসার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে বঙ্গভবনে বসে সব কলকাঠি নাড়বে, তা হতে পারে না। ওদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষে শুরু হয় উত্তেজনা। অবশেষে খালেদ মোশাররফ সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বাদ দিয়েই শক্তি প্রয়োগ করে বঙ্গভবনের মেজরদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনা হবে।

এর পরের কয়েকটি ঘটনা দ্রুত ঘটে চলে। ২ নভেম্বর দুপুর থেকেই সেনানিবাস থেকে ট্রুপস মুভমেন্ট শুরু হয়। ফারুক-রশীদরা বুঝতে পারে, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণ শো পিস ট্যাংক দিয়ে আর যাই হোক, পুরো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তাছাড়া তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন। এদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বিমানবাহিনীর মিগ আকাশে উড়ানো হয়। বিমানগুলো কয়েকবার বঙ্গভবনের উপর দিয়েও চক্কর দেয়। ভাবখানা এমন, প্রয়োজনে বঙ্গভবনেও বোমা ফেলা হবে। ফারুক-রশীদরা ভয় পেয়ে যায়। মুশতাক বুঝতে পারেন এই মেজররাই তার ক্ষমতার ভিত্তি, এরা যদি চলে যায় তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সে কারণে তার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের আর কেউ যেন নেতৃত্ব দিতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন আরেক ঘৃণ্য পরিকল্পনা। ওই দিন গভীর রাতে জিরো আওয়ারের পরে একদল ঘাতক পাঠিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়। এই জেলহত্যা বঙ্গভবনের সরাসরি নির্দেশে ঘটানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল এই চার নেতাকে সরকারি নিরাপত্তা হেফাযতে থাকা অবস্থায় হত্যার সংবাদে পরদিন মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

৩ নভেম্বর দিনের মধ্যেই ফারুক-রশীদরা ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে একটা আপস-রফায় আসেন। তারা বলেন, বঙ্গভবন ছেড়ে তারা আর সেনানিবাসে ফিরে যাবেন না। কারণ তারা বুঝতে পারছিলো, যে চেইন অফ কমান্ড তারা ভঙ্গ করেছে তার শাস্তি এক্ষেত্রে কোর্ট মার্শাল। রক্ত ঝরানো এড়াতে তারা দেশত্যাগের অনুমতি চায়। খালেদ মোশাররফ অযথা আরো প্রাণহানির পথে না গিয়ে তাদের সে প্রস্তাব মেনে নেন। ফলে বঙ্গভবন থেকেই ১৫ আগস্টের খুনিচক্র বিমানবন্দরে চলে যায়। ঢাকা থেকে প্রথমে তারা ব্যাংকক এবং পরে লিবিয়ায় যায়।

৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে মুশতাকের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালে কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সৈনিক সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে সবাইকে হ্যান্ডসআপ করায় এবং মুশতাককে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে গালিগালাজ করতে থাকে। মুশতাক ও তার মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যকে হত্যা করে ৩২ নম্বর থেকে শুরু করে জেলাখানা পর্যন্ত সব হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মুশতাকসহ মন্ত্রিপরিষদের সবারই তখন অত্যন্ত করুণ অবস্থা। তারা তাক করা অস্ত্রের সামনে ভীত ভেড়ার মতো কাঁপতে থাকে। এ সময় জেনারেল খলিলুর রহমান উত্তেজিত সৈনিকদের বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধমক খান। তবে শেষ পর্যন্ত জেনারেল ওসমানী তাদের

www.pathagar.com

নিবৃত্ত করেন। এ সময় খন্দকার মুশতাক উদাসভাবে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা আমার কাছে কি চাও?" জবাবে তারা জেনারেল জিয়াকে বরখাস্ত করে তার স্থলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করতে বলে। মুশতাক তাদের এই দাবি মেনে নেন। তাদের দাবি অনুযায়ী বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান করে জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। হত্যাকারীদের কি কারণে কি পরিস্থিতিতে দেশত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা নিরূপণের দায়িত্বও তদন্ত কমিটিকে দেওয়া হয়। (পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩)

৩ নভেম্বর রাতেই খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এই খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধকালে অসীম সাহসী বীরের ভূমিকা রেখেছিলেন। খালেদ মোশাররফের নতুন সেনাপ্রধান নিযুক্তি এবং ১৫ আগস্টের ঘাতকদের দেশত্যাগ সাধারণ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ক্ষমতায় কারা আসছে। এর মধ্যে পরের দিন ৪ নভেম্বর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থক একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একটি নাগরিক শোক মিছিল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসে। এ মিছিলে জেনারেল খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতাও ছিলেন। পরদিন এই মিছিলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হলে মুহূর্তে খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগপন্থি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। এ রকম একটা অবস্থার সুযোগ নেয় জাসদ এবং তাদের গোপন সংগঠন বিপ্লবী গণবাহিনী। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে এই সংগঠনটির তৎপরতা আগে থেকেই সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ছিলো। ক্যান্টনমেন্টে এ রকম একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাহেরের অনুসারীরা "দেশ ভারতের দখলে গেলো" বলে কিছু তরুণ অফিসারকে এবং "অফিসারদের এই সুযোগে সাইজ করতে হবে" এ কথা বলে সাধারণ সৈনিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়।

৪ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ক্যান্টনমেন্টে থেমে থেমে মাইকে ঘোষণা করা হতে থাকে, "ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তাদের সহযোগী খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে।" ভারতবিরোধী বক্তব্য ও খালেদ মোশাররফকে ভারতের দালাল বলে প্রচারপত্র বিলি হতে থাকে। এরই মধ্যে নিহত চার জাতীয় নেতার দাফন সম্পন্ন হয়। খালেদ মোশাররফের দাবি অনুযায়ী ৫ নভেম্বর খন্দকার মুশতাক বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ৬ নভেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়। বিচারপতি সায়েম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জেল হত্যার ঘটনাটি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকসহ সব স্তরেই ভীতির সঞ্চার করে। আমি নিজেও ক'দিনের জন্য গা-ঢাকা দেই। কিছুদিন আগাখানী ইউনুসের বাসায় এবং কিছুদিন শুক্রাবাদে আমার স্ত্রীর বোনের বাসায় আশ্রয় নেই।

কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক এবং এনসিও ও জেসিও র‍্যাঙ্কের অফিসাররা এবারের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়। 'সিপাহী-জনতা ভাই ভাই' এই স্লোগান দিয়ে ৬ নভেম্বর রাতেই এরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। জিয়া তখন সেনানিবাসে গৃহবন্দি। এরা জিয়াকে মুক্ত করে। এক পর্যায়ে বঙ্গভবন দখল করে নেয়। খালেদ মোশাররফ, মেজর হুদা

www.pathagar.com

ও মেজর হায়দার পালাতে গিয়ে সৈনিকদের গুলিতে নিহত হন। শাফায়াত জামিলসহ কয়েকজন আহত হয়। ৭ নভেম্বর সকালে ঢাকার রাজপথে আবার ট্যাঙ্ক দেখা যায়। সৈনিকরা তাতে জিয়াউর রহমান এবং মুশতাকের ছবি নিয়ে উল্লাস করে। জিয়া মুক্তি পেয়ে বেতার ভাষণের মাধ্যমে নিজেকে সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করে প্রথম বিশ্বাসভঙ্গ করেন তার মুক্তির পরিকল্পনাকারী ৭ নভেম্বরের রূপকার কর্নেল তাহেরের সঙ্গে।

এভাবেই ঘটে গেলো ক্ষমতার আরেক দফা পালাবদল। মুশতাক অপসৃত হলেন। ১৫ আগস্টের খুনিচক্র দেশছাড়া হলো। যারা এদের দেশছাড়া করলো, সেই খালেদ মোশাররফও নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন। ক্ষমতায় আসীন হলেন জিয়াউর রহমান।" (পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭৪)

৩ নভেম্বরের বিদ্রোহের পর্যালোচনা

খন্দকার মুশতাক আহমদের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ৭৯ দিন পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দেশের কোথাও জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য অসন্তোষের খবরও পাওয়া যায়নি। দেশ ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঐ বিদ্রোহ করা হয়নি। জনাব মিজান চৌধুরীর বর্ণনা অনুযায়ী কতক কর্নেল ও মেজর প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে কর্তৃত্ব করছে এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে ব্রিগেডিয়ার ও সিনিয়র অফিসারদের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তাই মুজিব হত্যাকারী জুনিয়র আর্মি অফিসারদেরকে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড মেনে চলতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই ঐ বিদ্রোহ করা হয়।

সেনাবাহিনীর মর্যাদা বহাল করা ও চেইন অব কমান্ড কায়েম করাই যদি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য হতো তাহলে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করা উচিত ছিলো। তিনি সেনাপ্রধানকে গৃহবন্দি করে সকল জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে অন্যায়ভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে তাঁকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করলেন। তার এ কর্মটি কি চেইন অব কমান্ডের জঘন্য লংঘন নয়? তার ঐ বিদ্রোহ নিছক ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার হীন উদ্দেশ্য বলেই প্রমাণিত হলো। এ কর্মটি করে তিনি সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেন এবং পরিণামে সিপাহীদের হাতে তিনি এবং আরও অনেক অফিসার নিহত হলেন। এতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো। এর জের ধরে আরও অনেক অফিসার চাকরিচ্যুত হন।

শেখ মুজিবের কুশাসনের আরও কতক তথ্য

ইতঃপূর্বে শেখ মুজিবের কুশাসন সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনীতিকের লেখা বই থেকে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছি। আগস্ট-বিপ্লবের অন্যতম নায়ক এবং রেডিওতে মুজিব হত্যার খবর ঘোষণাকারী মেজর শরিফুল হক ডালিমের (পরবর্তীতে লে. কর্নেল অব.) লেখা প্রায় সাড়ে পাঁচশ' পৃষ্ঠার গ্রন্থটি তখন পড়ার সুযোগ পাইনি। "যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি" নামে লেখাটি পড়ে এমন কতক তথ্য জানতে পেরেছি, যা বিভিন্ন সময় লোকমুখে কিছু শুনলেও সঠিক তথ্য পাইনি। আগস্ট-বিপ্লবের পটভূমি সম্যক

www.pathagar.com

বুঝতে হলে এবং বিপ্লবের বিস্ময়কর সাফল্য ও বিপ্লবের পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের কারণ অনুধাবন করতে হলে মেজর ডালিমের বই-এর মূল্যবান তথ্যসমূহ এখনও সবার জানা প্রয়োজন মনে করি। তাই এ কিস্তিতে তা পরিবেশন করছি। লে. কর্নেল (অব.) ডালিমের লেখা বইটির প্রকাশক নবজাগরণ প্রকাশনী, ৪৩৫/এ বড় মগবাজার, ঢাকা।

লে. কর্নেল (অব.) ডালিমের লেখা বইটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেলো, যা মুজিব শাসন ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরোধের পটভূমি স্পষ্টরূপে তুলে ধরে।

১. সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় চরম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকায় তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনকালেও তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ বহাল ছিলো।

২. মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হলো তাতে শুধু আওয়ামী লীগের নেতারাই একচেটিয়া কর্তৃত্ব দখল করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের নিকট তারা আশা করেছিলেন যে, তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দলীয় স্বার্থের চেয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সরকারে শরীক করলে তারা অবশ্যই খুশি হতেন।

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সেক্টরে সেনাবাহিনীর অফিসাররাই সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তাদের নেতৃত্বেই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা যুদ্ধে দায়িত্ব পালন করতো। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক কিশোর, তরুণ ও যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। এদের মধ্যে যারা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলো না, তারাই সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে।

৪. মুজিব সরকারের প্রথম এক বছরের শাসনেই মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা হতাশা বোধ করেন। পবিত্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার দেশ গড়ার প্রেরণা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে জনগণের খিদমত করবে এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে উন্নত করার চেষ্টা করবে– এ আশাই তারা করছিলেন। মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের থেকে শুরু করে সর্বস্তরে আওয়ামী লীগের লোকেরা দেশটাকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে সবাই বিত্তশালী হবার প্রতিযোগিতায় লেগে গেলো। শেখ মুজিব নিজের ছেলেদেরকে পর্যন্ত এসব অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করলেন না। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা গোপনে 'সেনা-পরিষদ' নামে সংগঠিত হওয়ার উদ্যোগ নিলেন।

৫. সেনা-অফিসাররা সাধারণত রাজনীতি-নিরপেক্ষই হয়ে থাকেন। যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকে, সে দলের নির্দেশ পালনই তাদের স্বভাব। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা যারা পালন করেছেন তারা শুধু অফিসারের মনোভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। শুধু দেশ রক্ষাই নয়, দেশ গড়ার জযবাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়াই

www.pathagar.com

স্বাভাবিক। দেশকে স্বাধীন করার জন্য জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জীবনবাজি রেখে তারা যুদ্ধ করেছেন দেশ ও জাতির কল্যাণের আশায়। তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। তাই তাদের মধ্যে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু অসন্তোষ নয়, ক্ষোভ সৃষ্টি হবারই কথা।

৬. বিভিন্ন কারণে শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন যে, সেনাবাহিনী তার সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় তার গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষীবাহিনী নামে বিকল্প সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন এবং সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার যোগ্য শক্তিতে পরিণত করলেন। রক্ষীবাহিনীর ইউনিফর্ম ভারতের সীমান্তে নিযুক্ত বাহিনীর অনুরূপ হওয়ায় এ সন্দেহও সৃষ্টি হল যে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ঠেকাবার জন্য ভারতের বাহিনীকেও রক্ষীবাহিনী হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। এসব কারণে সেনাবাহিনীর অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেলো।

মুজিব সরকারের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে দায়ী। সেসব ঘটনা আমার ভাষায় প্রকাশ করার চেয়ে কর্নেল ডালিমের লেখা থেকে পরিবেশন করাই আমি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ঘটনা

আন্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ থেকেই তৎকালীন সরকারের চরিত্র সম্পর্কে তারা ধারণা করতে পারবেন। দিনাজপুরের অপারেশন কমান্ডার একদিন ঢাকায় কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠালো, চারজন মারোয়াড়ী স্ম্যাগলার আর্মির ভয়ে ঢাকায় গিয়ে জনাব মনসুর আলীর ছেলে নাসিমের সাহচর্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মগোপন করে আছে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে মারোয়াড়ীদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আর্মি হেডকোয়াটার্সের হস্তক্ষেপে ঢাকার এরিয়া কমান্ডার জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাপের মুখেই আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে এ ধরনের হস্তক্ষেপ হয়েছিলো। ঐ ঘটনার পর সরকার আর্মির তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অপারেশনের ফলে একদিকে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে সরকার ও তার দলের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ায় ক্ষমতাসীনরা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ভেবে উভয় সংকটে পড়লো সরকার ও সরকারি দল। এই অবস্থাতেও দাতাগোষ্ঠীর চাপে সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলো খাদ্যসামগ্রী দেশের সকল অঞ্চলে সময়মত পৌঁছে দেবার। সেনাবাহিনী শুরু করলো 'অপারেশন ফুড'। এই অপারেশনেও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে সেনাবাহিনী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে। এই অপারেশন আর্মির হাতে দেওয়ায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় সরকারি দলের মাঝে। কারণ তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিলো প্রতিক্ষেত্রে। সব পর্যায়ে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত অপারেশন বন্ধের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হলো প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এতে জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে

www.pathagar.com

ব্যারাকে ফিরে আসে। সরকার প্রধানের এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে কর্নেল জিয়াউদ্দিন (ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার) অভিমত প্রকাশ করেন, "বর্তমান সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীতে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়। সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মাঝ থেকেই গড়ে তুলতে হবে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম।" তার অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেলাম, তিনি সক্রিয় রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপরিষদের মনোভাব ছিলো–তার বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন। সরকারবিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিশীলতা সৃষ্টি করেই। মূলত এ দায়িত্ব পালনের ভার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দল ও নেতৃত্বের উপর। তবে আমরাও সেনাবাহিনীর ভেতরে অবস্থান করেও জনগণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবো যদি নিজেদের সংগঠিত করতে পারি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দিন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, "Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."

নির্ভীক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পঁচিশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "We fought without him and won. If need be we will fight again without him."

শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় লন্ডনে গলব্লাডার অপারেশনের পর সুইজারল্যান্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কষ্টের এবং ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে আবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না তারা। তার এই লেখা থেকে দেশবাসী প্রথম পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রমাদ গুনলেন আর্মি চিফ শফিউল্লাহ। তিনি জিয়াউদ্দিনকে হাতে-পায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিলেন, যেন শেখ সাহেব ফিরে এলে ছাপানো নিবন্ধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ শফিউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন

www.pathagar.com

কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজ এবং সেনাবাহিনীতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীতে কোন প্রকার বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে তার জন্যই মিনতি জানিয়েছিলেন তিনি। শেখ মুজিব দেশে ফিরে বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে জেনারেল শফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন কি করে অবস্থার সামাল দেওয়া যায়? শফিউল্লাহ শেখ সাহেবকে জানালেন, নিবন্ধ ছাপানোর পর কর্নেল জিয়াউদ্দিনের ভাবমূর্তি তরুণ অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্নেল জিয়াউদ্দিনের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হলে আর্মির মধ্যে আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। শেখ মুজিব তার মোড়লি বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে কিছু বকাবকি করে তাকে দিয়ে কৌশলে মাফ চাইয়ে নেবেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হলো জেনারেল শফিউল্লাহকে। গণভবনে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে এলেন শফিউল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে স্যালুট করে দাঁড়াতেই গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব, "তুমি কোন্ সাহসে এ ধরনের নিবন্ধ ছাপালে? জানো, তোমার অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান? সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় এ ধরনের লেখা ছাপানো বেআইনী। আমি তোমাকে এ ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার বিশেষ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের মতো তোমাকে আমি মাফ করবো যদি তুমি শফিউল্লাহকে লিখিতভাবে দাও যে, তুমি অন্যায় করেছো।" একনাগাড়ে বলে গেলেন শেখ মুজিব। সবকিছুই চুপ করে শুনলেন জিয়াউদ্দিন। তিনি জবাব দিলেন, "শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি যা লিখেছি সেটা আমার বিশ্বাস। অতএব ক্ষমা চাওয়ার কিংবা ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই এখানে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, চাকরিতে থাকাকালীন অবস্থায় এ ধরনের লেখা ছাপানো অন্যায়। তাই আমি আমার কমিশনে ইস্তফা দিয়েই আমার নিবন্ধ ছেপেছি।" এভাবেই সেদিন শার্দুল সন্তান কর্নেল জিয়াউদ্দিন শেখ মুজিবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গণভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার বেরিয়ে আসার পর শফিউল্লাহকে শেখ মুজিব অনুরোধ করেছিলেন জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার জন্য। হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে এসে জেনারেল শফিউল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমুখ অনেকেই কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার শাণিত জবাব দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের আত্মার সাথে বেঈমানী করতে পারবেন না সামান্য চাকরির লোভে। তাছাড়া তাদের মতো মেরুদণ্ডহীন কমান্ডারদের অধীনে একই সংগঠনে তাদের অধীনস্থ হয়ে চাকরি করে তিনি তার আত্মসম্মান খোয়াতে রাজি নন। এভাবেই সেনাবাহিনীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর অন্যায়ভাবে কর্নেল তাহেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে ড্রেজার অর্গানাইজেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল তাহের জাসদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী থেকে তাকে বের করে দেবার পরও আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো। আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি। [পৃষ্ঠা : ৪০৮-৪১০]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ঘটনা

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আগে অবৈধ চোরাচালানের ফলে রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে সরকার চোরাচালান দমন করার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং সদস্যরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের আন্তরিকতা অল্পসময়ের মধ্যেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। এই অপারেশনের নাম ছিলো 'অ্যান্টি স্মাগলিং অপারেশন'। আমরা সমমনা সবাই সিদ্ধান্ত নেই যদিও তখনো আমরা সুগঠিত নই তবুও যে কোন ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাবো। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই অপারেশন করার সময়ই তরুণ অফিসার এবং সৈনিকগণ ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও টাউট বাটপারদের অসৎ চরিত্র এবং সম্পদ গড়ে তোলার লোভ-লালসার অভিলাষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক নেতা ও টাউটদের সঙ্গে তারা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে আসার সুযোগ পান। আমরা অপারেশন কমান্ডার হিসেবে প্রতিজ্ঞা করি পেটের ক্ষুধার তাড়নায় যে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা পোর্টার বোঝা বয়ে চোরাচালানের সামগ্রী বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে, জীবনে ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরেই ক্ষান্ত হবো না, আমাদের প্রচেষ্টা হবে চোরাচালানের মূল ব্যক্তিদের জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ক্ষমতাবলয়ের ঐ সমস্ত অসাধু রুই-কাতলাদের উন্মোচন করা; যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে জনগণের লাশের উপরে। অল্প সময়েই জানা গেলো সব সীমান্তে চোরাচালানের মূলে রয়েছে ভারতের একটি প্রভাবশালী মারোয়াড়ী গোষ্ঠী এবং সরকারি দলের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও নেতারা। শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী, তদীয় পুত্র নাসিম, বন ও মৎস্য মন্ত্রী সেরনিয়াবাত তদীয় পুত্র হাসনাত। গাজী গোলাম মোস্তফা সরাসরিভাবে ঐ মারোয়াড়ী চক্রের সাথে জড়িত বলেও তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এবং সরেজমিনে তদন্তের ফলে। সব ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে আমরা তাদের চরিত্র এবং দুষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে থাকি জনগণের কাছে। অফিসার এবং সৈনিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং নেতারাই হচ্ছে দেশের দুর্গতির মূল উৎস। তাদেরই যোগসাজশে লুটেরারা দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে তুলছে। সেনাপরিষদের প্রচারণা এবং সরকার সম্পর্কে সংগঠনের মূল্যায়নের সত্যতা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করার সুযোগ পান সেনা সদস্যরা। তারা বুঝতে পারেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই চাকরি ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনাপরিষদের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা তাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়েই সবকিছু করছিলেন। এর ফলে সেনাপরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিলো। এভাবেই সেনাবাহিনীতে সেনাপরিষদের ভাবমূর্তি এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। [পৃষ্ঠা : ৪০৭]

তৃতীয় ঘটনা

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনন্যোপায় হয়ে আবার সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতিকারী

www.pathagar.com

দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিলো তার। তবে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিলো যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এতো নিবিড় হয়ে উঠেছিলো যে, আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মতো উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হলো চিফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে, যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধানমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "৭২ সালের মতো সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him." খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করবো সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেওয়া হয়েছিলো জেনারেল শফিউল্লাকে। অপারেশনকে যে কোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেওয়া হলো কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেওয়া হলো মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। Combing Operation শুরু হলো। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেলো, সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব, তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিলো এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হলো

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকায় সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার-বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হলো দুষ্কৃতিকারীদের ধরা, সে যেই হোক না কেন। দল বিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হলো অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিলো তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রীরা। সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়লো শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামি-দামি নেতারা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুষ্কৃতকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা পাতি-নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হলো। লোকজন ভাবলো শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল'-এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে গেলো অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এলো। দুঃশাসনের ফলে নির্জীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হলো না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সবিচালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিলো অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান। হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এলো প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন, প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যে কোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন Area Commander হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও Control Room-এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন, তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে

www.pathagar.com

হয়েছিলো আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুড়ু ভাই) এ ধরনের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্ত্বর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর থাকতো না তার। জেনারেল জিয়ার আগমনের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হলো এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন্ চার্জে ধরা হয়েছে; প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন Operation Commander-রা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২ নং ধানমণ্ডিতে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখা মাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

–কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুষ্কৃতিকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তোদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

–স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুষ্কৃতিকারীদের ধরার জন্য। আমরা নির্দলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সি দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগার হয়, তাতে আমাদের দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

–যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত করো। জবাবে আমি বললাম,

–ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেওয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধীন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধীনে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

–বাজান! কিছু একটা করো নাইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শেষ হইয়া যাইবো।

www.pathagar.com

জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

–স্যার আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করবো। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। After all he is our Chief! ইতোমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নীচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন উঠলেন,

-কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেটটেন্যান্ট জহির এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবো। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

-স্যার ওরা সব জুনিয়র Subordinate officer, ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে, সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসেবে অধিনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং বললেন,

-ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হলো। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

-তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

-চাচা বিশ্বাস করেন, আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চিফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশি। সবাই মনে করছে এবার আপনি সত্যিই চাটার দল এবং টাউট-বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা হিসেবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সবচেয়ে বেশি।

-কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলুম কেমনে? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

-পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন, এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু

www.pathagar.com

মনে করবেন না চাচা; চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট-বাটপারদের নেতা হিসেবে পরিচিতি হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের চেয়ে খারাপ লোকজনই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

-বাঙ্গালি জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

-বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম,

-সব criminals and bad elements যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২ নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলিম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্ধর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা, অন্যদিকে সেনাবাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তোদের নিয়েই আমার চিন্তা। I hope you and your other colleauges don't get victimised.

আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। Don't over estimate Mujib, he is just an average man." আব্বার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে

www.pathagar.com

পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, "Chief will go with us to Comilla to release all those people." ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাইও ভীষণ Upset. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার ADC. তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "Well I know every thing. Don't loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely so forget about the rest and be at ease." চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চিফ নিজে গিয়ে বন্দিদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পড়িয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় intolerable humiliation সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন "Prime minister's desire is an order." এ ঘটনার ফলে সারাদেশে deployed আর্মির morale একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে Deployed ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।" [পৃষ্ঠা : ৩১৩-৩১৯]

বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা

শেখ মুজিবের আশকারা পেয়ে আওয়ামী লীগে এমন সব গড ফাদার সৃষ্টি হয়, যাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেও সামরিক অফিসারদের উপর পর্যন্ত চড়াও হবার দুঃসাহস করতে দ্বিধা করতো না। দাপট দেখাবার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস থাকায় তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করতো।

ঐ গড ফাদারদের একজন ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। চরম দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে তিনি বিয়ের মজলিস থেকে মেজর ডালিমকে তার সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যান। মেজর ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ের ব্যবস্থাপনায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। মেজর ডালিমের শ্যালক কানাডা থেকে এসে বিয়েতে শরীক হয়। এক কামরায় কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে তার সাথে দুষ্টুমি করায় সে একটি ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেয়। ঐ ছেলেটি ঘটনাক্রমে গাজী গোলাম মোস্তফার ঘনিষ্ঠ কেউ হয়ে থাকবে। সে ছেলেটি হয়তো গাজী সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। মেজর ডালিমের এ ক্ষুদ্র ঘটনা জানা থাকার কথা নয়। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজী সাহেব স্বয়ং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে লেডিস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বিয়ের মজলিসে হামলা করে বসলেন।

বিদেশী অনেক পত্রিকায়ও এ ঘটনার খবর বের হয়েছে। দেশে তো অবশ্যই বিস্তারিত প্রকাশ পেয়ে থাকবে। আমার মতো অনেকেই ঐ ঘটনার সঠিক বিবরণ জানার জন্য আগ্রহী থাকতে পারেন। তাই দীর্ঘ হলেও ঐ ঘটনাটি এখানে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পরিবেশন করছি ঃ

"১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ঘটে এক বর্বরোচিত অকল্পনীয় ঘটনা। দুষ্কৃতিকারী দমন অভিযানে সেনাবাহিনী তখনও সারাদেশে নিয়োজিত। আমার খালাতো বোন তাহ্‌মিনার

www.pathagar.com

বিয়ে ঠিক হলো কর্নেল রেজার সাথে। দু'পক্ষই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তাই সব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছিলো আমাকে এবং নিম্মীকেই। ঢাকা লেডিস ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গণ্যমান্য সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে হোমরা-চোমরা এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করতে হচ্ছিলো নিম্মী এবং আমাকেই। আমার শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে কানাডা থেকে। বিয়েতে সেও উপস্থিত। বিয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবেই এগিয়ে চলছে। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবার উপস্থিত রয়েছেন অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় বাপ্পি বসেছিলো। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসেছিলো গাজীর ছেলেরা। বয়সে ওরা সবাই কমবয়সী ছেলে-ছোকরা। বাপ্পি প্রায় আমার সমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে কৌতুকচ্ছলে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে দু'তিনবার চুলে টান পড়ার পর বাপ্পি রাগান্বিত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে,

-চুল টানছে কে?

-আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা। জবাব দিলো একজন। পুঁচকে ছেলেদের রসিকতায় বাপ্পি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণ ক্ষেপে যায়; কিন্তু কিছুই বলে না। মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পড়ে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিলো তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে,

-বেয়াদব ছেলে মশকারী করার জায়গা পাওনি? খবরদার তুমি আর ঐ জায়গায় বসতে পারবে না। এ কথার পর বাপ্পি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। এ ঘটনার কিছুই আমি জানতাম না। কারণ তখন আমি বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার প্রায় সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর্বও শেষ। অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলো। মাহবুবের আসার কথা। মানে এসপি মাহবুব। আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। আমরা সব একই সাথে যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। কি এক কাজে মানিকগঞ্জ যেতে হয়েছিলো তাকে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে তার ফিরতে একটু দেরি হবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ দু'টো মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকলো লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টো থেকে নামলো প্রায় ১০-১২ জন অস্ত্রধারী বেসামরিক ব্যক্তি। গাড়ি থেকেই প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

-কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বার বেড়েছে। তাকে আজ আমি শায়েস্তা করবো। কোথায় সে? আমি তখন ভেতরে সবার সাথে খাচ্ছিলাম। কে যেন এসে বললো গাজী এসেছে। আমাকে তিনি খুঁজছেন। হঠাৎ করে গাজী এসেছেন কি ব্যাপার? ভাবলাম বোধ হয় তার পরিবারকে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। আমি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাইরে এলাম। বারান্দায় আসতেই ৬-৭ জন স্টেনগানধারী আমার বুকে-পিঠে-মাথায় তাদের অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তো হতবাক! সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং গাজী। আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

www.pathagar.com

-ব্যাপার কি? এ সমস্ত কিছুর মানেই বা কি?

তিনি তখন ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত। একনাগাড়ে শুধু বলে চলেছেন,

-গাজীরে চেনো না। আমি বঙ্গবন্ধু না। চল্ শালারে লইয়া চল্। আইজ আমি তোরে মজা দেখামু। তুই নিজেরে কি মনে করছস?

অশালীনভাবে কথা বলছিলেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম,

-কোথায়, কেন নিয়ে যাবেন আমাকে?

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার অস্ত্রধারী অনুচরদের। তার ইশারায় অস্ত্রধারী সবাই তখন আমাকে টানা-হেঁচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ে উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে আমার এস্কট সিপাহীরাও রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যা দান তখনও করা হয়নি। কি কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতোমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে নিম্মী এবং খালাম্মা মানে তাহ্মিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দর মহল থেকে। খালাম্মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন,

-ভাই সাহেব, একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্ত করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কি দোষ করেছে ও?

গাজী তার কোন কথারই জবাব দিলেন না। গাজীর হুকুমের তামিল হল। আমাকে জোর করে ঠেলে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। বাসে উঠে দেখি আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। আমাকে গাড়িতে তুলতেই খালাম্মা এবং নিম্মী দু'জনেই গাজীকে বললো,

-ওদের সাথে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেবো না আমরা।

-ঠিক আছে, তবে তা-ই হবে। বললেন গাজী।

গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। বেচারী খালাম্মা! বয়স্কা মহিলা, আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাইক্রোবাসের ভিতরে। আমার দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে থাকলো পাঁচজন অস্ত্রধারী; গাজীর সন্ত্রাস বাহিনীর মাস্তান। গাজী গিয়ে উঠলো তার কারে। বাকি মাস্তানদের নিয়ে দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটা কোথায় যেন চলে গেলো। মাইক্রোবাস দু'টি ছিলো সাদা রঙের এবং তাদের গায়ে ছিলো রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিলো তখন আমার ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন বীরবিক্রম ও বাপ্পি লেডিস ক্লাবে উপস্থিত ছিলো না। তারা গিয়েছিলো কোন এক অতিথিকে ড্রপ করতে। আমাদের কাফেলা লেডিস ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে লিটুর মুখে। সবকিছু জানার পরমুহূর্তেই ওরা যোগাযোগ করলো রেসকোর্সে আর্মি কন্ট্রোল রুমে,

www.pathagar.com

তারপর ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা পৌঁছে দিলো স্বপন। তারপর সে বেরিয়ে গেলো ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু আমার ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং আমার বন্ধু। ও ছুটে গেলো এসপি মাহবুবের বাসায় বেইলি রোডে। উদ্দেশ্য মাহবুবের সাহায্যে গাজীকে খুঁজে বের করা।

এদিকে আমাদের কাফেলা গিয়ে থামলো রমনা থানায়। গাজী তার গাড়ি থেকে নেমে চলে গেলো থানার ভিতরে। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন গাজী। কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। কাফেলা এবার চলছে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে। ইতোমধ্যে নিম্মী তার শাড়ি ছিড়ে চুল্লু ও আলমের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে নাতো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম,

-গাড়ি থামাও!

আমার বলার ধরনে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিলো। আমাদের গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়লো। আমি তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললাম গাজী সাহেবকে ডেকে আনতে। সে আমার কথার পর গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গাজীকে গিয়ে কিছু বললো। দেখলাম গাজী নেমে আসছে। কাছে এলে আমি তাকে বললাম,

-গাজী সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে যা-ই চিন্তা করে থাকেন না কেন; লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোন কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমার কথা শুনে কি যেন ভেবে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কাফেলা আবার চলা শুরু করলো। তবে এবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে নয়, গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চললেন ৩২নং ধামমণ্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসার দিকে। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। কলাবাগান দিয়ে ৩২নং রোডে ঢুকে আমাদের মাইক্রোবাসটা শেখ সাহেবের বাসার গেট থেকে একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় থামাতে ইশারা করে জনাব গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ৩২নং এর ভিতরে। সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এবার ভাবলাম ওদের ডাকি, আবার ভাবলাম এর ফলে যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস-ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্তই চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ দেখি লিটুর ঢাকা ক-৩১৫ সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে হুস্ করে এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবের বাসার গেটে গিয়ে থামলো। লিটুই চালাচ্ছিলো গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলো এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে গেলো সে। লিটু একটু গিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে থামিয়ে অপেক্ষায় রইলো। সম্ভবত মাহবুবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। লিটু এবং মাহবুবকে দেখে আমরা সবাই আস্বস্ত হলাম। নির্ঘাত বিপদের হাত থেকে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

লিটু যখন মাহবুবের বাসায় গিয়ে পৌঁছে মাহবুব তখন মানিকগঞ্জ থেকে সবেমাত্র ফিরে বিয়েতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। হঠাৎ লিটুকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে আসতে দেখে তার দিকে চাইতেই লিটু বলে উঠলো,

-মাহবুব ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে গাজী বিনা কারণে ডালিম-নিম্মীকে জবরদস্তি Gun point-এ উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

একথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেওয়া দরকার কোন অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোন বিশ্বাস নেই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টেলিফোনটাই বেজে উঠে। রেড টেলিফোন। মাহবুব ত্রস্তে উঠিয়ে নেয় রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী অপর প্রান্তে,

-মাহবুব তুই জলদি চলে আয় আমার বাসায়। গাজী এক মেজর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ধইরা আনছে এক বিয়ার অনুষ্ঠান থ্যাইকা। ঐ মেজর গাজীর বউ-এর সাথে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করছিলো। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বেশি বাড় বাড়ছে সেনাবাহিনীর অফিসারগুলি।

সব শুনে মাহবুব জানতে চাইলো,

-স্যার গাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মেজর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোথায় রেখেছেন তিনি।

-ওদের সাথে কইরা লইয়া আইছে গাজী। গেইটের বাইরেই গাজীর গাড়িতে রাখা হইছে বদমাইশগুলারে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

-স্যার গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মীকেই তুলে এনেছে লেডিস ক্লাব থেকে। ওখানে ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিলো আজ। জানালো মাহবুব।

-কছ কি তুই! প্রধানমন্ত্রী অবাক হলেন।

-আমি সত্যিই বলছি স্যার। আপনি ওদের খবর নেন আমি এক্ষুণি আসছি।

এই কথোপকথনের পরই মাহবুব লিটুকে সঙ্গে করে চলে আসে ৩২নং ধানমণ্ডিতে। মাহবুবের ভিতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেহানা, কামাল ছুটে বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুকে রক্তক্ষরণ দেখে শেখ সাহেব ও অন্যান্য সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠেন।

-হারামজাদা, এইডা কি করছোস তুই?

গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। খালাম্মা ঠিকমত হাঁটতে পারছিলেন না। কামাল, রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেলো। শেখ সাহেবের কামরায় তখন আমি, নিম্মী আর গাজী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। নিম্মী দুঃখে-গ্লানিতে কান্নায় ভেঙে পড়লো। শেখ সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মতো কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিলো আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোস্ট বসিয়ে

www.pathagar.com

প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিডন্যাপিং-এর খবর পাওয়ার পরপরই ইয়ং-অফিসাররা যে যেখানেই ছিলো সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মীকে। সমস্ত শহরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। গাজীরও কোন খবর নেই। গাজীকে এবং তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্ন তন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেলো। ফোন পেয়েই তিনি আমাদের সামনেই আর্মি চিফ শফিউল্লাহকে হট লাইনে বললেন,

-ডালিম, নিম্মী, গাজী সবাই আমার এখানে আছে, তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।

ফোন রেখে শেখ সাহেব গাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

-মাফ চা নিম্মীর কাছে (নিম্মী ডালিমের স্ত্রী)।

গাজী শেখ সাহেবের হুকুমে নিম্মীর দিকে এক পা এগুতেই সিংহীর মত গর্জে উঠলো নিম্মী,

-খবরদার! তোর মতো ইতর লোকের মাফ চাইবার কোন অধিকার নেই; বদমাইশ।

এরপর শেখ মুজিবের দিকে ফিরে বললো নিম্মী,

-কাদের রক্তের বদলে আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী? আমি জানতে চাই। আপনি নিজেকে জাতির পিতা বলে দাবি করেন। আজ আপনার কাছে বিচার চাই। আজ আমার জায়গায় শেখ হাসিনা কিংবা রেহানার যদি এমন অসম্মান হতো তবে যে বিচার আপনি করতেন আমি ঠিক সেই বিচারই চাই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আপনারা জাতির কর্ণধার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তাদের গায়ে হাত দেওয়ার মতো সাহস কম্বলচোর গাজী পায় কি করে? এর উপযুক্ত জবাব আমি চাই আপনার কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু চেয়েছি আপনার কাছে, কিন্তু আজ দাবি করছি ন্যায্য বিচার। আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আমি আল্লাহর কাছে এই অন্যায়ের বিচার দিয়ে রাখলাম। তিনি নিশ্চয়ই এর বিচার করবেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মীকে শান্ত করতে পারিনি। ঠাণ্ডা মেজাজের কোমল প্রকৃতির নিম্মীর মধ্যেও যে এ ধরনের আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার কাছেও আশ্চর্য লেগেছিলো সেদিন। শেখ সাহেব নিম্মীর কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন, -মা তুই শান্ত হ। হাসিনা-রেহানার মতো তুইও আমার মেয়েই। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করবো। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করছে গাজী, কিন্তু তুই মা শান্ত হ। বলেই রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মীকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন। রেহানা এসে নিম্মীকে উপরে নিয়ে গেলো। ইতোমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছে। শেখ সাহেব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাকে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে Operation Commander মেজর মোমেনের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন,

-হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ বলছি প্রাইম মিনিস্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মী, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিস্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন।

www.pathagar.com

Everything is going to be all right. Order your troops to stand down এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। অপরপ্রান্ত থেকে মেজর মোমেন জেনারেল শফিউল্লাহকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার ও তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের তার হাতে সমর্পণ না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল থাকলেন শফিউল্লাহর সব যুক্তিকে অসাড় প্রমাণিত করে। অবশেষে শফিউল্লাহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে Operation Commander-এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সাথে কথা বলতে। আমি অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম,

-হ্যালো স্যার। মেজর ডালিম বলছি। Things are under control প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায়বিচার করবেন।

-Well Dalim it's nice to hear from you. But as the Operation Commander I must have my demands met. I got to be loyal to my duty as long as the army is deployed for anti-miscreant's drive. The iddentified armed miscreants cannot be allowed to go escort free. As far as I am concerned the law is equal for everyone so there cant' be any exception. Chief has got to understand this. বললেন মেজর মোমেন।

-Please Sir, why don't you comeover and judge the situation yourself. অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি।

-There is no need for me to come. However, I am sending Capt. Feroz বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর মোমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়লো। ফিরোজ আমার বাল্যবন্ধু। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

-তুই গাজীরে মাফ কইরা দে। আর গাজী তুই নিজে খোদ উপস্থিত থাকবি কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অনেকটা মোড়লি কায়দায় একটা আপসরফা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

-আমার বোনের সম্প্রদানের জন্য গাজীকে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে মাফ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে আমার নীতিবিরোধিতা। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি রক্তের বিনিময়ে। আমাদের গা থেকে রক্ত ঝরাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। ইউনিফর্মের চাকরি করি টাকা-পয়সার লোভেও নয়। একজন সৈনিক হিসেবে আমার আত্মমর্যাদা এবং গৌরবকে অপমান করেছেন গাজী নেহায়েত অন্যায়ভাবে। আপনিই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অবৈধ অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করে আইনানুযায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সেখানে আজ আমাদেরই ইজ্জত হারাতে হলো অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে! আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে

www.pathagar.com

কথা দিয়েছেন এর উচিত বিচার করবেন। আমরা আপনি কি বিচার করেন সেই অপেক্ষায় থাকবো।

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ্য করে সবার সামনেই বলেছিলাম,

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন, সেক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কি? কর্নেল মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, ঠিক সেই সময় শেখ সাহেব বললেন,

-আমার গাড়ি তোদের পৌঁছে দেবে।

-তার প্রয়োজন হবে না চাচা। বাইরে লিটু-স্বপনরা রয়েছে তাদের সাথেই চলে যেতে পারবো।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ৩২নং এর সামনে রাস্তায় গাড়ির ভীড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা যারাই জানতে পেরেছে আমাদের কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারটা; তাদের অনেকেই এসে জমা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমাদের দেখে সবাই ঘিরে ধরলো। সবাই জানতে চায় কি প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘন্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ফিরে এলাম লেডিস ক্লাবে। মাহবুবও এলো সাথে। মাহবুবের উসীলায় সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম চরম এক বিপদের হাত থেকে আল্লাহ পাকের অসীম করুণায়। বিয়ের আসরে আমরা ফিরে আসায় পরিবেশ আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠলো। সবাই আবার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বিয়ের বাকি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কন্যা সম্প্রদান করা হলো।

ঘটনার পরদিন সকালেই আমার ডাক পড়লো আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলাম চিফ আমাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়লো জেনারেল জিয়ার অফিসে। মেজর হাফিজ তখন PS-Cord to DCAS. সেই আমাকে খবর দিলো জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন। সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন, "This is incredible and ridiculous. This is simply not acceptable. ঠিক আছে দেখো চিফ কি বলে।" তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই হাফিজ তার ঘরে নিয়ে গেলো। নূরও ছিলো সেখানে। হাফিজ বললো, "দ্যাখো ডালিম, গতরাতের বিষয়টা শুধুমাত্র তোমার আর ভাবীর ব্যাপারই নয়; সমস্ত আর্মির Dignity, pride and honour are at stake. মানে আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। You got to understand this clearly ok? অন্যান্য সব ব্রিগেডের সাথে আলাপ হয়েছে, তারাও এ ব্যাপারে সবাই একমত। This has got to be sorted out right and proper. শেখ মুজিব কি বিচার করবে? আমরা শফিউল্লাহর মাধ্যমে দাবি জানাবো আর্মির তরফ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সে দাবি অবশ্যই মানতে হবে। দাবিগুলোও আমরা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি শফিউল্লাহ কি বলে সেটা শুনে আসো, তারপর যা করবার সেটা আমরা করবো।"

www.pathagar.com

আর্মি হেডকোয়াটার্স-এ সমস্ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। হাফিজের অফিস থেকেই চীফের ADC-কে ইন্টারকমে জানালাম, "I am through with DCAS, so I am free now to see the Chief." "Right Sir." বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ADC, কিছুক্ষণ পরই ADC হাফিজের কামরায় এসে জানালো চিফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চীফের অফিসে ঢুকতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখী।

-How are you?

-Fine Sir.

-How is Nimmi?

-She is ok Sir, but terribly upset.

-Quite natural. But she is a brave girl I must say. The way she talked to the Prime minister was really commendable. এ সমস্ত কথার পর আসল বিষয়ের উপস্থাপনা করলেন জেনারেল শফিউল্লাহ,

-দেখো ডালিম, গতরাতের ঘটনায় প্রধামন্ত্রী নিজেই দুঃখ এবং অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। I am also very sorry about the whole affair. শেখ সাহেব তো তোমাদেরও আপনজন। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাদের দু'জনকেই। তিনি যখন চাইছেন তুমি গাজীকে মাফ করে দাও, তার সে ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে সেটাই তো তিনি আশা করছেন। তুমি যদি গাজীকে মাফ করো তবে তিনি খুশি হবেন তাই নয় কি?

-স্যার, তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পারিবারিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও আছে; সেটাও সত্য। তিনি ও তার পরিবার আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আপস আমি করতে পারবো না, সেটা আপনার সামনেই তাকে আমি বলে এসেছি। And I shall stick to that till the end.

-Well that's up to you then. I have nothing more to tell you.

-Thank you Sir. বলে বেরিয়ে এসে দেখি চীফের অফিসের সামনে AHQ-র প্রায় সব অফিসার একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলো চিফ কি বললেন। আমি আমাদের কথোপকথনের সবটাই তাদের হুবহু খুলে বললাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো সবাই। একজন ADC-কে বললো, "Go and call him out here, we want to talk to him."

ADC-এর মাধ্যমে অফিসারদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। চিফ বললেন,

-বলো, তোমাদের কি বলার আছে?

-স্যার, গতরাতের ঘটনা শুধুমাত্র মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমরা আজ যেখানে দুষ্কৃতিকারী দমনের জন্য সারাদেশে deployed সেই পরিস্থিতিতে বিনা কারণে গাজী ও তার সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আমাদেরই একজন অফিসার এবং তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনী নয়?

www.pathagar.com

"It has compromised the honour and the dignity of the whole armed forces particularly army. We can't take it lying. It has got to be sorted out right and proper." কথাগুলো বললো একজন। জেনারেল শফিউল্লাহ জবাবে বলার চেষ্টা করলেন,

-Well, the Prime minister is personally very sorry about the whole affair.

-That's not enough! শফিউল্লাহকে থামিয়ে দিলো একজন।

-Now Sir, you being our Chief and the leader have to shoulder your responsibility to uphold the honour and the dignity of the army. সমগ্র সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আমাদের ৩টি দাবি আপনাকে জানাচ্ছি।

১. গাজীকে তার সংসদপদ এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারি পদ থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এবং তার অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে আর্মির হাতে সোপর্দ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে, যাতে করে আইনানুযায়ী তাদের সাজা হয়।

২. গতরাতের সমস্ত ঘটনা সব প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেশের জনগণকে অবগত করার অনুমতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

৩. যেহেতু গাজী আওয়ামী লীগের সদস্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আপনাকে আমাদের এই ৩টি দাবি নিয়ে যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। এই দাবিগুলো আপনি যদি আদায় করতে অপারগ হন তবে You have got no right to sit on your chair. You will be considered not fit enough to lead this army.

ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। থতমত খেয়ে বেসামাল অবস্থায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই লেফটেন্যান্ট শমসের মুবিন চৌধুরী বীরবিক্রম তার কোমরের বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো জেনারেল শফিউল্লার পায়ের কাছে,

-We serve the army for our pride, honour and dignity. If that is not there then I hate to serve that army any longer.

উত্তেজিতভাবে উপস্থিত সবাই একই সাথে বলে উঠলো,

-Sir, you got to restore our lost honour and dignity. We have had enough humiliation but no more. Sir, Please don't be afraid. We all are with you. Just try to understand the gravity of the problem and be one of us.

বাইরের শোরগোল শুনে জেনারেল জিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিলেন আমরা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তিনি তার গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,

-Boys be quite and listen to me. I have heard everything and I appreciate your sentiment. I have also understood the problem. Your demands are just and fair. Shafiullah you must go with their demands

www.pathagar.com

to the Prime Minister and make him understand the gravity of the situation and suggest him to accept the demands for the greater interest of the nation and the armed forces.

জেনারেল শফিউল্লাহ যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন,

-আমি এখনই যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তক্ষুণি তিনি বেরিয়ে গেলেন গণভবনের উদ্দেশ্যে। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। শফিউল্লাহ চলে যাবার পর আমরাও মেসে চলে এলাম লাঞ্চের জন্য। এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। শফিউল্লাহকে যখন ঘেরাও করা হয়েছিলো, তখন সেখানে কর্নেল এরশাদও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য PSO-দের সাথে। তিনি তখন AG (Adjutant General) হিসেবে হেডকোয়ার্টার্স-এ পোস্টেড ছিলেন। এক সময় জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

-এরশাদ তোমার অভিমত কি?

-Sir, I think their demands quite legitimate. এ ধরনের ঘটনা আপনার কিংবা আমার সাথেও ঘটতে পারতো। যেখানে Army is deployed to maintain law and order and engaged in anti-miscreant drive সেখানে এ ধরনের একটা ঘটনাকে শুধুমাত্র ডালিম-নিম্মীর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে consider করা উচিত হবে না। It is definitely a question of honour and prestige of the entire army and you being the Chief must make this point clear to the Prime minister and advise the PM correctly to restore the lost honour by accepting the demands.

তার জবাব শুনে আমরা বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন Repatriated officer. তিনি সাহস করে ঐ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। এতেই প্রমাণিত হয় পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সন্ধ্যার দিকে চিফ ফিরলেন গণভবন থেকে; সারাদিন দরবার করে। রাত ৮টার দিকে তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন সেনা ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল শাফায়াত এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কুশলাদি বিনিময় করে সবাই বসলাম। চিফ শুরু করলেন,

-আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। তিনি সময় চেয়েছেন। Prime minister যখন সময় চেয়েছেন তখন তাকে সময় আমাদের দিতে হবেই। চীফের কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন কর্নেল শাফায়াত। ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিশ্চুপ বসেছিলেন।

-স্যার 'তোমাদের দাবিগুলো' বলে আপনি কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আপনার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? দাবিগুলো ছিলো entire army-র তরফ থেকে। তবে কি আমাদের বুঝতে হবে আপনি বা আপনারা মানে the senior lots are not with us? জানতে চাওয়া হলো জেনারেল শফিউল্লাহর কাছ থেকে। তিনি এ ধরনের কথায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। চালাক প্রকৃতির ব্রিগেডিয়ার খালেদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে শফিউল্লাহর হয়ে জবাব দিলেন,

www.pathagar.com

-Boys don't have wrong impression. Of course we all are together. How could we be different on this issue?

-কিন্তু স্যার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন না। সময় চেয়ে নিয়ে তিনি প্রথমত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তার অবস্থানকে পোক্ত করার জন্যই সময় চেয়েছেন তিনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের দাবি মানতে রাজি না হন তবে কি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই আমরা।

তিনজনই এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।

-Well Sir, if you don't have any idea what to do next then we shall think what needs to be done. বলে চলে এসেছিলাম আমরা। (পৃষ্ঠা ৪২৭-৪৩৯)

এ পর্যন্ত ঘটনার যতটুকু জানা গেলো তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গাজীর আচরণের বিরুদ্ধে সেনা অফিসারদের সবাই ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ তাদের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করতে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

সেনাপ্রধান অফিসারদের দাবিসমূহ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে ফিরে এসে যা বললেন, তাতে অফিসাররা বুঝতে পারলেন যে, তাদের দাবি মানার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী দাবি না মানলে সেনাপ্রধান কোন প্রতিকারের সামান্য আশ্বাসও দিতে অক্ষম হলেন।

অফিসাররা রীতিমতো সেনাপ্রধানকে হুমকি দিলেন যে, আপনি যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে আমাদেরকেই ভাবতে হবে কী করা প্রয়োজন।

শেখ মুজিবের আজব সুবিচার

অফিসারদের কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরে শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত সেনাপ্রধান ও ব্রিগেড কমান্ডার বিক্ষুব্ধ অফিসারদের হুমকি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য পেরেশান হয়ে সেনা সদর থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন। অফিসাররা টের পেয়ে একজনকে মোটর সাইকেলে পেছনে পেছনে পাঠিয়ে দেন। এ সম্পর্কে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"আজিজ পল্লীর এক বাসায় বৈঠকে বসলাম আমরা। বিষয়বস্তু, দাবি মানা না হলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। অন্যান্য ব্রিগেডের সাথে যোগাযোগ করে মতামত বিনিময় করা হচ্ছিলো সবসময়। রাত প্রায় ১১টার দিকে খবর পেলাম জেনারেল শফিউল্লাহর সাদা ডাটসন কারে দু'জন লোক সিভিল ড্রেসে চাদর মুড়ি অবস্থায় ২নং গেইট দিয়ে বেরিয়ে ৩২নং ধানমণ্ডির দিকে যাচ্ছে। একজন young officer-কে মোটর সাইকেল নিয়ে গাড়িকে ফলো করতে বলা হলো। রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে ঐ অফিসার ফিরে এসে জানালো, গাড়িতে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল শাফায়াত। তারা গিয়ে ঢুকেছিলেন শেখ সাহেবের বাসায়। রাত প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে খবর আসতে লাগলো শহরে রক্ষীবাহিনীর মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। দুই-এ দুই-এ চার; মিলে গেলো হিসাব। শফিউল্লাহ এবং শাফায়াত শেখ সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধায় ৩২ নম্বরে গিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আলোচনার সবকিছুই জানিয়ে এসেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে; আর্মির তরফ থেকে যে কোন move-এর মোকাবেলা করার জন্য। নিজেদের প্রতি তার অনুকম্পা আরো বাড়াবার জন্যই ব্যক্তিপূজার এক ঘৃণ্য উদাহরণ! রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকে খবর আসতে লাগলো, মধ্যরাত্রির পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর অস্বাভাবিকভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার মানে নিজের নিরাপত্তার জন্য শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার অনুগত রক্ষীবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর তার তল্পিবাহক নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না, তাই বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও চেয়ে বসেছেন মৈত্রী চুক্তির আওতায়। আমরা কয়েকজন শহর ঘুরে দেখলাম খবরগুলো সত্যি। দুঃখ হলো, পেশাগত নিজ যোগ্যতায় নয়, শেখ মুজিবের বদান্যতায় যারা এক লাফে মেজর থেকে জেনারেল বনে গেছেন তারা নিজেদের চামড়া পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন শেখ সাহেব এবং তার দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিলো, জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনি একজন। কিন্তু কথায় আছে Exception is never an example. ধিক্কার এসে গিয়েছিলো আমাদের মনে এ সমস্ত মেরুদণ্ডহীন মতলববাজ সিনিয়র অফিসারদের চারিত্রিক দুর্বলতা জানার পর। পরদিন শফিউল্লাহর ডাক পড়লো গণভবনে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গত দু'দিনের তুলনায় আজ তাকে বেশি confident দেখাচ্ছিলো,

-Well Dalim, the Prime minister has asked for time as you have been already told. Meanwhile, I am ordering a court of inquiry about the whole matter that has happened so far just for an official record. Once the court of inquiry is finished you will go back to Comilla.

-Right Sir বলে সেল্যুট করে বেরিয়ে এসেছিলাম তার অফিস কক্ষ থেকে। কী অদ্ভুত যুক্তি! দোষ করলো গাজী গোলাম মোস্তফা আর court of inquiry হবে আমার! বর্তমান অবস্থায় চীফের হুকুম মেনে নিয়ে court of inquiry-র পরিণাম পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে সিদ্ধান্ত হলো। court of inquiry শেষ করে কয়েকদিন পর কুমিল্লায় ফিরে এলাম।

মাসখানেক পর জুলাই মাসের শেষার্ধে এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা পার্টি ছিলো। নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই এসে গেছে। বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। হুদা ভাবীও এসে গেছেন কিন্তু হুদা ভাইয়ের পাত্তা নেই। বেশ একটু দেরি করেই এলেন কর্নেল হুদা। ভীষণ শুকনো তার মুখ। অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি। এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে এককোণায় গিয়ে বসলেন তিনি। বুঝা যাচ্ছিলো, কারো সাথে কথাবার্তা বলার তেমন একটা ইচ্ছে নেই তার। সদা উচ্ছল হুদা ভাই এতো নীরব কেন? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। এক ফাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

-কি হয়েছে হুদা ভাই? কোন অঘটন ঘটেনি তো?

-না কিছু না।

নিজেকে কিছুটা হালকা করে নেবার জন্য ড্রিংকসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। নিম্মী অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ হুদা ভাই নিম্মীকে ডেকে পাশে বসালেন। প্রশ্ন করলেন,

www.pathagar.com

-আচ্ছা নিম্মী ধরো এমন একটা খবর তুমি পেলে, যার ফলে তোমার এই সুন্দর সাজানো সংসারটা ওলট-পালট হয়ে গেলো, তোমাদের এই সুখ কেউ কেড়ে নিলো তখন কি করবে?

নিম্মী অবাক বিস্ময়ে হুদা ভাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে বললো,

-আজ আপনার কি হয়েছে হুদা ভাই? কী সব এলোমেলো বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেন না কি হয়েছে? আমিও এরি মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছি।

-ডালিম ঢাকা থেকে কোন খবর পেয়েছো? জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হুদা।

-না তো। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই পেতাম। প্লিজ হুদা ভাই রহস্য বাদ দিয়ে বলেন না কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

-যা হবার নয় তাই হয়েছে। presidential Order No-9 (PO-9) প্রয়োগ করে আর্মি থেকে ৮ জন অফিসারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তুমি এবং নূরও রয়েছ এই ৮ জনের মাঝে। খবরটা অপ্রত্যাশিত; তাই হজম করতে কিছুটা সময় লাগলো। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে নিম্মীকে ডেকে বললাম,

-জানো, take it easy. নিজেকে সামলে নাও। Don't get upset and spoil the party. Let this be over then we shall think about it. Now be brave as you have always been and act like a good host OK?

মেয়ে মানুষ, তার উপর ভীষণ স্পর্শকাতর এবং কোমল প্রকৃতির নিম্মী। তবুও সেদিন অতিকষ্টে সবকিছুই সামলে নিয়েছিলো সে। অতিথিদের কেউ-ই কিছু বুঝতে পারেনি কি অঘটন ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। খবরটা তখন পর্যন্ত কেউ জানতো না। পার্টি শেষে একে একে অভ্যাগতদের সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। থেকে গেলেন শুধু হুদা ভাই ও ভাবী। ভাবীকে খবরটা দেওয়া হলো। খবরটা জেনে ভাবী ভেঙে পড়লেন। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। নিম্মীও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না; ক্ষোভে-কান্নায় জড়িয়ে ধরলো ভাবীকে। আমি ও হুদা ভাই দু'জনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হুদা ভাই বললেন,

-Come on now both of you hold yourselves, this is not the end of the world. Allah is there and He is great. Please stop crying and think what should be done.

নীলু ভাবী কাঁদছেন আর হুদা ভাইকে বলে চলেছেন,

-Gudu you must do something about this injustice. You have to do whatever necessary. This is simply outrageous. You must not take this lying noway. Get this very clear. নীলু ভাবীর আন্তরিকতায় মন ভরে গেলো।

-I got it Nilu I got it, Please comedown. I Promise you, I shall go out of my way to redress this. Nimmi you too Please stop crying, don't you have faith on your Huda Bhai? আমাকে বললেন,

-কাল তোমাকে নিয়ে আমি ঢাকায় যাবো এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবো। নিম্মী তুমিও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ফোন এলো। নূর বললো,

www.pathagar.com

-Sir, we have been sacked under PO-9. We need your presence here as soon as possible. জবাব দিলাম,

-আমি এবং হুদা ভাই কালই আসছি। টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিন ব্রিগেডের সবাই খবরটা জেনে গেলো। কর্নেল হুদা সকালেই CO'S conference call করলেন। সেখানে তিনি বললেন,

-ডালিম এবং আমি ঢাকায় যাচ্ছি। I can assure you all that I personally shall do everything to redress this shocking injustice. এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার অসন্তোষও কম নয়।

ঢাকায় এলাম আমরা। আর্মি হেডকোয়াটার্স-এ চরম উত্তেজনা। শফিউল্লাহ অফিসে নেই। তিনি নাকি অসুস্থ। জেনারেল জিয়া আমি এসেছি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। তিনি সিট থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বল্পভাষী লোক। বললেন,

-Have faith in Allah. He does everything for the better. This is just the beginning and I am sure manymore heads will roll.

দোয়া করবেন স্যার। ঠিকই বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। বললাম আমি।

-We must keep-in touch and you can count on me for everything just as before. For any personal need my doors are always open to you.

-Thank you very much Sir. You are most kind. But you must remain alert as you are our last hope. Future will say what is there in our common destiny.

MS branch থেকে PO-9 এর লিখিত orderটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি ও নূর সেনা সদর থেকে। Retirement orderটা যখন হাতে নিচ্ছিলাম তখন মনে পড়েছিলো শেখ সাহেব সস্নেহে নিম্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিলেন সুবিচার করবেন তিনি। সেই সুবিচারের ফলেই আজ আমি চাকরিচ্যুত হলাম বিনা কারণে।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নেল হুদা গিয়ে হাজির হলেন ৩২নং ধানমণ্ডিতে। অতি পরিচিত সবকিছুই। কিন্তু এবারের আসাটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তাই পরিবেশটা কিছুটা অস্বস্তিকর। রেহানা, কামাল সবাই কেমন যেন বিব্রত! পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললাম,

-কি কামাল বিয়ের দাওয়াত পাবো তো? আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে কামাল উত্তর দিলো,

-কি যে বলেন বস! আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ও নিম্মীকে দাওয়াত করে আসবো। আপনাদের ছাড়া বিয়েই হবে না। রেহানা চা-নাস্তা নিয়ে এলো। হুদা ভাই চুপ করে বসে সবকিছু দেখছিলেন। বাসায় ফিরে এলেন শেখ সাহেব। ডাক পড়লো আমাদের তিন তলার অতিপরিচিত ঘরেই। একাই বসে ছিলেন শেখ সাহেব। ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাবার পর কর্নেল হুদা বললেন,

www.pathagar.com

-এতোবড় অন্যায়কে মেনে নিয়ে চাকরি করার ইচ্ছে আমারও নেই স্যার। বলেই পকেট থেকে একটা পদত্যাগপত্র বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,

-আমার এই পদত্যাগপত্রের Official copy through proper channel শীঘ্রই আপনার কাছে পৌঁছবে। তার এ ধরনের আকস্মিক উপস্থাপনায় কিছুটা বিব্রত হয়েই শেখ সাহেব বললেন,

-তোমরা সবকিছুই একতরফাভাবে দেখো। আমার দিকটা একটুও চিন্তা করো না। একদিকে আমার পার্টি আর অন্যদিকে ওরা। আমি কি করুম? পার্টির কাছে আমি বান্দা। পার্টি ছাড়া তো আমার চলবো না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

-তুই আর নূর কাইল আমার সাথে রাইতে বাসায় দেখা করবি।

শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার সময় হুদা ভাইয়ের চোখে পানি এসে গিয়েছিলো। পরদিন জেনারেল শফিউল্লাহর অফিসে আমার ডাক পড়লো। চিফ আমাকে নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় আমার আর ফিরে যাওয়া চলবে না। নিম্মীকে পাঠিয়ে জিনিসপত্র সব নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্নেল হুদা এই নির্দেশের জোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শফিউল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বদলালেন না। কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না তিনি। কুমিল্লায় ফিরে আমি যদি আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে বসি! এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর যে আর্মি গঠন প্রক্রিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম রাতদিন; সেই আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী বিদায় নেওয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিলো আমাকে। একজন সৈনিকের জন্য এই অবমাননা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আমি ঢাকায় রয়ে গেলাম। হুদা ভাই নিম্মী ও খালাম্মাকে নিয়ে ফিরে গেলেন কুমিল্লায়।

আমাকে কুমিল্লায় ফিরতে না দেওয়ায় অফিসার এবং সৈনিকরা অসন্তোষ-ক্ষোভে ফেটে পড়লো। একদিন দুই ট্রাক সৈনিক কুমিল্লা থেকে আমাদের মালিবাগের বাসায় এসে হাজির। আমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবলে আমাকে চাকরিচ্যুত করেছে; তার উপর যে রেজিমেন্ট আমি শুরু থেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি সেই ইউনিটের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সংবর্ধনাও জানাতে পারবে না ইউনিটের সদস্যরা; সেটা কিছুতেই হতে দেবে না তারা। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা আমাকে নিয়েই যাবে। পরিণামে যা কিছুই ঘটুক না কেন; তার মোকাবেলা করা হবে একত্রিতভাবে; সে সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে ইউনিটে। Emotionally charged অবস্থায় পরিণামের বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পদক্ষেপ তারা নিতে প্রস্তুত হয়েছে তার ফল তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে সেটা তারা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়ে অনেক ব্যথা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো তারা। ফিরে যাবার আগে আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা বলেছিলো, "স্যার আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি; একথাটা ভুলবেন না কখনো। প্রয়োজনে ডাক দিয়ে দেখবেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো।" একজন কমান্ডার হিসেবে অধীনস্থ সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরনের দুর্লভ সম্মান

www.pathagar.com

পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর বেশি আর কি লাভ করা সম্ভব হতো চাকরিতে থাকলেও। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদভারে অনেক জেনারেল এবং কমান্ডার রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের কতজনের ভাগ্যে এ ধরনের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জুটেছে! আবেগ এবং আত্মতৃপ্তির অনাবিল আনন্দে সেদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি! খুশির জোয়ার নেমে এসেছিলো দু'চোখ বেয়ে। মনে হয়েছিলো আমার সৈনিক জীবনের যবনিকাপাত অতি আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও স্বল্প পরিসরের এ জীবন আমার সার্থক হয়েছে। শুধু কুমিল্লা থেকেই নয়; দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকেও অফিসার-সৈনিকরা সুযোগ-সুবিধামতো আসতে থাকলো সমবেদনা জানাবার জন্য। সবার একই আক্ষেপ, কেন এমন অবিচার; এতোবড় অন্যায়??? জবাবে সবাইকে বলেছি, "স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ তাআলাই সব ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাতেই যে কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে থাকে, কিন্তু তার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিই আবার শাস্তিস্বরূপ সে ক্ষমতা কেড়ে নেন। সব অত্যাচারীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন; এ ঈমানের জোর আমার আছে। আমি তোমাদের দোয়া চাই আর কিছুই নয়।

হালে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফরকালে সেখানে রেডিওতে আমিনুল হক বাদশাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার বাবা সেনাবাহিনী গড়েছিলেন বলেই মেজররা জেনারেল হতে পেরেছিলেন।" একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। এটা অতি সত্য কথা যে, মেজর থেকে যাদের জেনারেল বানানো হয়েছিলো তাদের অনেকেরই জেনারেল হবার যোগ্যতা ছিলো না। কিন্তু তবুও তাদের জেনারেল বানানো হয়েছিলো। এর কারণ ছিল শেখ মুজিব চেয়েছিলেন অযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে সেনা বাহিনীকে দুর্বল করে রাখতে এবং ঐ সমস্ত অযোগ্য 'খয়ের খাঁ' টাইপের জেনারেলদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তার ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করতে। কিন্তু সেটা ছিলো তার দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের উপর ঐ সমস্ত 'জী হুজুর!' জেনারেলরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। (পৃষ্ঠা : ৪৪০-৪৪৬)

শেখ মুজিবের ইমেজ খতম

সেনা অফিসারদের চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ারই কথা। সুবিচারের ওয়াদা করে তিনি যালিমদের রক্ষা করলেন এবং মযলুমদের উপর স্বয়ং চরম যুলুম করলেন।

মেজর ডালিমের লেখা থেকে জানা গেলো যে, তার পিতার সহপাঠি হিসেবে শেখ মুজিবকে তিনি চাচা ডাকতেন এবং উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব ডালিম এবং ডালিমের পক্ষে যে অফিসাররা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেন তাদের সবাইকে চাকরিচ্যুত করলেন।

সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এ অবিচারের ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তারা সরাসরি তার সাথে যে বিতর্ক করেছেন তাতে তিনি একেবারেই

www.pathagar.com

লা-জওয়াব হয়ে পড়েন। তিনি সেনা-অফিসারদের নিকট যে মোটেই শ্রদ্ধার পাত্র নন তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনা-অফিসারদের বিপ্লবকে ঠেকাবার জন্য সেনাপ্রধান হিসেবে কেন তিনি কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি তা এখন স্পষ্ট। শেখ মুজিব স্বয়ং সেনাপ্রধানকে ফোন করেও কোন সাড়া না পাওয়ার কারণ এটাই। সেনা-অফিসারদের দাবি মেনে সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি খন্দকার মুশতাক আহমদের আনুগত্য করতে বাধ্য হন এ কারণেই।

গাজীর চরম বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও শেখ মুজিব তার কোন বিচার না করে উল্টো ৮ জন সেনা-অফিসারকে চাকরিচ্যুত করার কারণে গোটা সেনাবাহিনীর সকল অফিসারদের নিকট শেখ মুজিবের ইমেজ একেবারেই খতম হয়ে গেলো। সে সাথে সেনাপ্রধান ও তার সহযোগী দু'একজন সিনিয়রের মর্যাদা চরমভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলো। এ পটভূমিতে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলছিলো তা আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো তখন, যখন গাজী গোলাম মোস্তফার মতো শেখ মুজিবের অনুচর ৬১ জন গভর্নরের অধীনে সেনাবাহিনীকে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেজর ডালিমের লেখা থেকে আরও একটা তথ্য জানা গেলো যে, জিয়াউর রহমান সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করায় গোটা সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বিরাজ করে। অফিসার ও সৈনিকরা মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণেই সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে মেজর জিয়ার ইমেজ অত্যন্ত সমুন্নত ছিলো। তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার অপরাধেই তাঁকে সেনাপ্রধান করা নিরাপদ মনে করা হয়নি। আরও ধারণা হলো যে, জিয়াউর রহমান সেনাপতি হলে বিকল্প সেনাবাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনীকে গড়ে তোলা সমর্থন করতেন না।

মেজর ডালিম পদচ্যুত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে সংলাপের সময় ডালিম জিয়াকে সম্বোধন করে "You are our last hope" বলে যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তা থেকেও জেনারেল জিয়ার প্রতি সেনা-অফিসারদের পরম আস্থার কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

৩ থেকে ৭ নভেম্বরের নাটকীয় ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আগস্ট-বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লব ঘটান এবং ৭ নভেম্বর সিপাহীরা প্রতি-বিপ্লব ব্যর্থ করে আগস্ট-বিপ্লবকে পুনর্বহাল করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কেমন করে এতো বড় নাটকীয় ঘটনাবলি ঘটে গেলো এর বিবরণ জানার জন্য আমার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে জনাব অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থে এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিন কাল' গ্রন্থে সামান্যই জানতে পেলাম, যা পূর্বে আলোচনা করেছি। ৩ নভেম্বরের পরের ঘটনাবলিতে মেজর ডালিম সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাই তার লেখা বিবরণ তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত নয়। তবে মেজর ডালিমের গ্রন্থ

www.pathagar.com

থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবকে ব্যর্থ করার ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের ভূমিকাই প্রধান এবং এ সুযোগে কর্নেল তাহের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করে জাসদকে ক্ষমতাসীন করার প্রচেষ্টা চালান। আমি ভাবলাম, তাহলে তো ঐ সময়কার সরাসরি জ্ঞান জাসদের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থেকেই যোগাড় করা সম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেলো এবং তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য যোগাড় করা গেলো, যাতে ঐ সময়কার ঘটনাবলির সঠিক বিশ্লেষণ করা সহজ মনে হলো। উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ঘটনাবলির বিশ্লেষণের ভিত্তিমূলক তথ্যাবলি

১. শেখ মুজিবের কুশাসনে হতাশ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা 'সেনাপরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়াবাড়ি ও ঐ ঘটনার বিচারের দাবিদার ৮ জন সামরিক কর্মকর্তার পদচ্যুতির পর 'সেনাপরিষদ'-এর সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পেলো। বাকশাল গঠনের পর সামরিক বিপ্লবের পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেলো। ৬১ জন গভর্নর নিয়োগের পর বিপ্লব সাধনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো।

২. কর্নেল তাহের মুক্তিযুদ্ধে এক পা হারান। এ অজুহাতে তাঁকে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নারায়নগঞ্জে ড্রেজারের ডাইরেক্টর করা হয়। চাকরিচ্যুত মেজর ডালিমের সাথে কর্নেল তাহেরের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘনিষ্ঠতার কারণে সব অবস্থায়ই গভীর যোগাযোগ বহাল ছিলো। কর্নেল তাহের জাসদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে মেজর ডালিমের নেতৃত্বে জাসদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে 'সর্বহারা পার্টির' দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক তৎপরতার দরুন কর্নেল তাহেরের ধারণা ছিলো যে, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত সেনাবাহিনী সরকার পতনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব। তাই তিনি সেনাপরিষদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও গোপনে 'বৈপ্লবিক সৈনিক সংস্থা' গঠন করেন। জনগণের ময়দানে কর্নেল তাহের 'গণবাহিনী' নামে আরও একটি গোপন সংগঠন গড়ে তুলেন। সিরাজ শিকদারের 'সর্বহারা পার্টি'র পক্ষে কর্নেল জিয়াউদ্দিন গোপন 'সশস্ত্র বাহিনীর' নেতৃত্ব দেন।

৩. সেনাপরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাকশাল সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন কায়েম করা সঠিক মনে করেনি। দুর্নীতি দমন ও চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনীর যে সুনাম হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই শাসনক্ষমতা থাকা উচিত। সেনাবাহিনী যে ক্ষমতালোভী নয় তা প্রমাণ করা প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন খতম করে গণতন্ত্রের পুনর্বহালই সেনা-বিপ্লবের উদ্দেশ্য, যাতে জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

৪. সেনাপরিষদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রমনা রাজনীতিক তালাশ করতে গিয়ে শেখ মুজিবের পরই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা, মন্ত্রিত্ব থেকে বিতাড়িত জনাব তাজউদ্দীনের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করলে তারা জানতে পারলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যারা বাকশাল গঠনের প্রতিবাদ করতে সাহস না করলেও স্বৈরশাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে ধারণা ছিলো তাদের সাথেও যোগাযোগ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম হলো সর্বজনাব কামরুজ্জামান, খন্দকার মুশতাক আহমদ, মালেক উকিল ও আবদুল মান্নান। ব্যাপক যোগাযোগের পর সেনাপরিষদ সব দিক বিবেচনা করে খন্দকার মুশতাক আহমদকেই সবচেয়ে সিনিয়র, দেশপ্রেমিক, জনদরদি, বিশ্বস্ত গণতন্ত্রী, আদর্শবাদী ও জনপ্রিয় বলে ঐকমত্যে পৌঁছে। মুক্তিযুদ্ধকালে তাকে তারা ভারতের আধিপত্যবিরোধী বলে মনে করতেন।

৫. জাসদ নেতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পাওয়া গেলো, যা আর কোন উৎস থেকে জানা যায়নি। শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণে জাসদই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো। অপরদিকে সেনাবাহিনীতে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কতক অফিসার ও বেশ কিছু সৈনিক সংঘবদ্ধ ছিলো। সিরাজ শিকদার ও কর্নেল জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টিও এক বিরাট ফ্যাক্টর ছিলো। তাদের সাথে জাসদ নেতৃবৃন্দ ও কর্নেল তাহেরের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা অসম্ভব ছিলো না।

তার মতে, এমন একটি সম্ভাবনাময় বিরাট আন্দোলন এক রহস্যময় ব্যক্তির হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, ঐ ব্যক্তিটি দলের কোন পদে না থেকেও দলীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারেই সিদ্ধান্ত দিতেন এবং তা কার্যকর হয়ে যেতো। বিস্মিত হয়ে ঐ ব্যক্তিটির পরিচয় জানতে চাইলাম। তার নাম বললেন সিরাজুল আলম খান। এ নামটি আমার অজানা ছিলো না, কিন্তু দলে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম যে, এ লোকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় কেমন করে? বললেন, সিরাজুল আলম খানের নির্দেশ সামরিক অঙ্গনে কর্নেল তাহের ও রাজনৈতিক ময়দানে হাসানুল হক ইনু কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করতেন। জানতে চাইলাম, জনাব খান সাংগঠনিক দিক দিয়ে কোন দায়িত্বশীল না হওয়া সত্ত্বেও তার সিদ্ধান্ত কেমন করে বাস্তবায়িত হয়ে যেতো? বললেন, এ রহস্য আমার জানা নেই। তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।

নভেম্বরের পয়লা সপ্তাহের ঘটনাবলির পটভূমি

সর্বস্তরের জনগণ, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগস্ট-বিপ্লবকে সমর্থন করায় বিপ্লব পূর্ণ সফলতা লাভ করে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র মুশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি চীন ও সৌদি আরব শেখ মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও মুশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিলো।

খন্দকার মুশতাক আহমদের ৭৯ দিনের শাসনকালে জনগণ, প্রশাসন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক সমাজ, ছাত্র অঙ্গন বা অন্য কোন মহলে সামান্য অসন্তোষও দেখা দেয়নি। বরং মুশতাক সরকারের যাবতীয় পদক্ষেপ বিপ্লবপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতা,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়।

১৯৭৫-এর অক্টোবরের শেষ দিকে ঢাকা সেনা নিবাসে CGS (চিফ অব জেনারেল স্টাফ, যিনি সেনাপ্রধানের সহকারী) ব্রিগেডিয়ার মোশাররফ হোসেন ও ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল (৩য় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) প্রতি-বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছেন বলে আভাস পাওয়া গেলো। সারা দেশের অন্যান্য সেনা-নিবাসের সেনাপরিষদ থেকে কোন অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত দু'ব্যক্তি আগস্ট-বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেই নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাদের জুনিয়র অফিসাররা বঙ্গভবনে অবস্থান করে দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট মুশতাককে সাহায্য করছেন দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাদের এ প্রচেষ্টা আগস্ট-বিপ্লবের নায়কদেরকে উৎখাত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার উদ্যোগ হলেও তারা আগস্ট-বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিলের দোহাই দিয়েই এ অপকর্মে অগ্রসর হন। অথচ আগস্ট-বিপ্লবের নায়কদের সহযোগিতায়ই প্রেসিডেন্ট মুশতাক বিপ্লবের মহান লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সরকারের পদক্ষেপসমূহ

প্রেসিডেন্ট মুশতাক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিভিন্ন দিকে এমন সব পদক্ষেপ নিতে থাকেন, যাতে আগস্ট-বিপ্লবের লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়। সে বিষয়ে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"রেডক্রস-এর চেয়ারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ সিদ্দিককে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মুশতাক এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্নর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকগদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬ জন মন্ত্রী, ১০ জন সংসদ সদস্য, ৪ জন আমলা এবং ১২ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দু'টো বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজবন্দিদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫ আগস্ট। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বিমান বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

www.pathagar.com

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৬ আগস্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তারা সবাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মুশতাক ঘোষণা করেন, "১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।"

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিলো তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কল-কারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়।" (পৃষ্ঠা : ৪৯৫)

সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন

বিপ্লবোত্তর সরকার সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেন। এ বিষয়েও মেজর ডালিমের ভাষায়ই দেখুন ঃ

"জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে Proper Screening-এর পর সেনাবাহিনীর সাথে একত্রীভূত করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তিকে সুসংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সেনাপরিষদের পক্ষ থেকে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানকারী জেনারেল ওসমানীকে নিয়োগ করা হয় প্রেসিডেন্ট মুশতাকের সামরিক উপদেষ্টা। তার মূল দায়িত্ব ছিলো বাংলাদেশের উপেক্ষিত সামরিক বাহিনীর সার্বিক কাঠামো নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাঁচে গড়ে তোলা। সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের কাজটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো খুবই জটিল এবং দুরূহ একটি কাজ। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাছাই করে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। সেনাবাহিনী থেকে বাকশালীমনা, দুর্নীতিপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষীদের বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনমতো ইউনিটগুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রচুর রদবদল করতে হবে। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ সমস্ত কাজে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সেনাপরিষদের সদস্যরাই ছিলো জেনারেল জিয়ার মূল শক্তি। তাদের সার্বিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই জেনারেল জিয়া তার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। আওয়ামী-বাকশালী আমলে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত অফিসারদের সামরিক বাহিনীতে পুর্নবহালের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই নীতি কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।" (পৃষ্ঠা : ৫০০)

www.pathagar.com

সেনাপরিষদের কর্মসূচি

আগস্ট-বিপ্লবের পূর্বেই সেনাপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবের যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, খন্দকার মুশতাক সরকার তা-ই বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে থাকেন। সেনাপরিষদের প্রণীত ঐ কর্মসূচি মেজর ডালিম তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে জরুরি অংশটুকু পরিবেশন করছি ঃ

"বিপ্লবের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়; তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে, কিন্তু এভাবে সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়ানোর পরিণামে সে সমস্ত দেশে উচ্চাভিলাষী সামরিক শাসকবৃন্দের গোষ্ঠীস্বার্থই চরিতার্থ হয়েছে; জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ হয়নি। কোন বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করা আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লবের চরিত্র হবে অন্যান্য দেশে সাধারণভাবে সংঘটিত যে কোন ক্যু'দাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেনাপরিষদ দেশবাসী এবং সারাবিশ্বে প্রমাণ করবে, বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর বৃহৎ অংশ দেশপ্রেমিক; ক্ষমতালিপ্সু সুযোগ সন্ধানী নয়। অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনগণের রক্ষক হয়ে ভক্ষক বনে যাবার অভিপ্রায় তাদের নেই। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নির্ভীক, নিবেদিত প্রাণ সৈনিক তারা। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপ্লব। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো হবে, যাতে করে সুষ্ঠু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটাবার জন্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সংগঠিত হতে পারেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব হবে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের। সেনাবাহিনী দেশ ও জাতীয় স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাবে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। প্রমাণ করা হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। জাতীয় স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী স্বার্থ নয়। অনন্য এই বিপ্লব নিখাঁদ দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসেবে স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

১. রুশ-ভারত নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

২. মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩. 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' নামে বাকশাল ও মুজিব সরকারের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

৪. কৌশলগত কারণে স্বল্পসময়ের জন্য সংসদকে বলবৎ রেখে সাংবিধানিকভাবে একটি দেশপ্রেমিক সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকার গঠন করা।

www.pathagar.com

সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব

১. বাকশাল প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আইনের পরিপন্থী শ্রমিক আইন ও অন্যান্য কালা-কানুন বাতিল করা।

২. রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে দেশে অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩. সকল রাজবন্দির বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া।

৪. সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৫. জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ছেলে-মেয়েদের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৬. সমাজতন্ত্রের নামে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব ও সরকারি সহযোগিতায় জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান ও অবাধ দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত দেউলিয়া অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭. জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

৮. প্রশাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

৯. রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিশ্চিত করার সাথে সাথে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

১০. পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা।" (পৃষ্ঠা : ৪৮৮ ও ৪৮৯)

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের সূচনা

CGS ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ দ্বিতীয় সেনাপ্রধান ব্যক্তি। তিনি যদি সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের যথাযথ আনুগত্য না করেন তাহলে সেনাপ্রধানের কোন সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হতে পারে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ভূমিকা সম্পর্কে মেজর ডালিম লিখেন ঃ

"কিছুদিন পর একদিন জেনারেল জিয়া জানালেন, তার কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করছে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে কিছু বাকশালপন্থি অফিসার। ব্রিগেডিয়ার খালেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু ভীষণ উচ্চাভিলাষী। তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য অতি কৌশলে যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি তার শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। মুজিব সরকার ও বাকশালীদের সহানুভূতিও ছিলো তার প্রতি। আচমকা বাকশালী সরকারের পতনের ফলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে কোন উপায়েই তার পরিকল্পনা কার্যকরী করে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে। তার

www.pathagar.com

এই হীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারছিলেন না জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার প্রতি ব্রিগেডিয়ার খালেদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলো বাকশালী চক্র এবং তাদের মুরুব্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দোসর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ১৫ আগস্ট পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আগস্ট-বিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূচনা ঘটানো হলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টেও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে লাগলো। ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রধান উসকানিদাতা ছিলো কর্নেল শাফায়াত।" (পৃষ্ঠা : ৫০১)

সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া খালেদ ও শাফায়াতের সাথে একান্তে বৈঠক করলেন। তারা সহযোগিতার ওয়াদা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ভিন্ন ছিলো। তিনি সমস্যাটা জেনারেল ওসমানীকে জানালেন। ডালিমের ভাষায় ঃ

"তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না খালেদ এবং শাফায়াত এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে! কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরা যখন বিস্তারিত রিপোর্ট তার সামনে পেশ করলেন তখন অসহায় আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল শাফায়াতকে ডেকে তাদের সাথে জেনারেল জিয়ার বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে একইভাবে তাকে আস্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো, এই চক্রান্তে হাত রয়েছে বাকশালীদের একটি চক্র এবং তাদের সার্বিকভাবে মদদ যোগাচ্ছিলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালাচ্ছে আর্মির মধ্যে কিছু লোকের মাধ্যমে একটি প্রতি-বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে ২৫ বছরের আওতায় বাংলাদেশে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আবার একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা।" (পৃষ্ঠা : ৫০৩)

জনাব জিল্লুর রহমান খান "Leadership Crisis in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন, "খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিলো একটি মুজিবপন্থি পাল্টা অভ্যুত্থান। কারণ চার নেতা বীরদর্পে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।" পৃষ্ঠা ৫০৩)

"ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার চামচারা তখন সেনাবাহিনীতে জোর প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, জেনারেল জিয়া যোগ্য বিপ্লবী নন; তার দ্বারা আগস্ট-বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলির বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। তিনি সর্বময় ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে কারসাজি করে চলেছেন অতি ধূর্ততার সাথে। এক্ষেত্রে সবাইকে তার বিকল্পের কথা ভাবতে হবে। সাধারণ সৈনিকদের কাছে জিয়া ছিলেন আদর্শের প্রতীক। সততার জন্য তার জনপ্রিয়তাও ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু তারই সহযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি অংশের বিরূপ প্রচারণা সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। ফলে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরও ঘোলাটে।" (পৃষ্ঠা : ৫০৪)

www.pathagar.com

"সময়ের সাথে জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। প্রায় প্রতিদিন রাতেই আমি ছুটে যাচ্ছি সেনানিবাসে তাদের বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সবার মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো খুবই Close and informal. নীতি-আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদমর্যাদার ভেদাভেদ এসব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিলো সেই সম্পর্ক। যুদ্ধকালীন সময় থেকেই আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো একের প্রতি অপরের অদ্ভুত নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। সেই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিলাম খালেদ ভাই এবং কর্নেল শাফায়াতকে বোঝাতে; কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টাতে তেমন কোন লাভ হচ্ছিলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে হুদা ভাইকে অনুরোধ জানালাম ঢাকায় আসার জন্য। কর্নেল হুদা তখন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার। হুদা ভাই এবং খালেদ ভাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একেবারে হরিহর আত্মা। হুদা ভাই ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট বক্তা, সৎ এবং উদারপন্থি চরিত্রের। এ ধরনের চরিত্রের লোক ছিলেন বলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন হয়েও এবং শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধভক্তি থাকা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার সচেতন মন কিছুতেই আওয়ামী দুঃশাসন মেনে নিতে পারেনি। এর ফলেই কুমিল্লায় ব্রিগেড কমান্ডার থাকাকালে আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন হুদা ভাই। (এ ব্যাপারে আগেই বিস্তারিত লেখা হয়েছে) ভেবেছিলাম হুদা ভাইকে দিয়ে খালেদ ভাইকে বোঝাতে, তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। জিয়াবিরোধী চক্রান্ত থেকে নিরস্ত্র করার এটাই হবে আমার শেষ প্রচেষ্টা। খবর পেয়ে হুদা ভাই এলেন ঢাকায়। তার সাথে আমার বিস্তারিত খোলাখুলি আলাপ হলো। সবকিছু শোনার পর হুদা ভাই কথা দিলেন সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বোঝাতে। পরপর দু'দিন বৈঠক করলেন তিনি খালেদ ভাই-এর সাথে। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। কোন যুক্তি দিয়েই তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন না হুদা ভাই। সেই রাতের কথা ভোলার নয়.....।" (পৃষ্ঠা; ৫০৬ ও ৫০৭)

কর্নেল হুদা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, "ডালিম, খালেদ ভীষণভাবে হতাশ করেছে আমাকে। ও কিছুতেই বুঝলো না। জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে কোন আপস করতে রাজি নয় খালেদ। তার মতে জিয়া আগস্ট-বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেই ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে চলেছে, যেটা তোমরাও নাকি বুঝতে পারছো না। তার এ ধরনের চিন্তা এবং একগুঁয়েমির পরিণাম কি হতে পারে সেটা ভাবতেও গা শিঁউরে উঠছে আমার। শুধু তাই নয়, জিয়ার বিরুদ্ধে আমার সমর্থনও চেয়েছে খালেদ।

আমি তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম,

-এই অবস্থায় কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন স্যার?

-ঠিক বুঝতে পারছি না to be honest. চিন্তিতভাবে জবাব দিয়েছিলেন হুদা ভাই। এরপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে ছিলাম আমরা।

www.pathagar.com

-খালেদকে বোঝাতে না পারলেও কাছে থাকলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা যেতো। By the way I don't know whether you know about this or not. Brigadier Nuruzzaman is also with Khaled. খালেদের অনুরোধ আমার পক্ষে সরাসরিভাবে উপেক্ষা করাটাও would be very difficult because of our relation. You know how close we are.

-তা জানি। কিন্তু এতো জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেবার মতো ব্যাপার স্যার।

-ঠিকই বলেছো তুমি। আমি কি করবো সেটা জানি না তবে খালেদকে আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি এই মুহূর্তে যে কোন কারণেই হোক না কেন জেনারেল জিয়া অথবা মুশতাক সরকারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলেই পরিগণিত হবে এবং জনগণ ও সৈনিকরা সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাছাড়া জেনারেল জিয়া সেনাপরিষদের মনোনীত সেনাপ্রধান; সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকলে সেটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসনে বাধা কোথায়? I think he has been intrigued and is being used by some unknown quarters. শেষের কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বললেন হুদা ভাই। চক্রান্ত সম্পর্কে অনেক খবরা-খবরই আমাদের জানা আছে; সে বিষয়ে কোন আলাপ না করে আমি শুধু বলেছিলাম,

-Well Sir, decision is yours. আপনি একজন বিবেকবান পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক এবং মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী; তাই যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন ভবিষ্যতে। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ব্যক্তি সম্পর্কের থেকে জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিবেন আপনি সে প্রত্যাশাই করবো আমি। দেখা যাক কি হয়? আল্লাহ ভরসা। সবকিছুইতো পরিষ্কার বুঝে গেলেন। আমি যোগাযোগ রাখবো। আমার অনুরোধ রক্ষা করে রংপুর থেকে ছুটে এসেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলের ঔদ্ধত্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। জেনারেল জিয়ার প্রায় সব নির্দেশই উপেক্ষা করে চলেছেন তারা। প্রতি রাতেই মধ্যস্থতার জন্য ছুটে যেতে হচ্ছে তাদের বিরোধের মীমাংসা করার জন্য। সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ভীষণভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছেন তারা।" (পৃষ্ঠা : ৫০৭ ও ৫০৮)

"ক্রমান্বয়ে আর্মির Chain of command-কে অকেজো করে তুলেছে CGS ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং ঢাকা Brigade Commander কর্নেল শাফায়াত জামিল। জেনারেল জিয়া তাদের হাতে প্রায় জিম্মী হয়ে পড়লেন। চিফ অফ আর্মি স্টাফ হিসেবে তার দৈনন্দিন কার্যক্রমেও তারা বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।" (পৃষ্ঠা : ৫১০)

ব্রিগেডিয়ার খালেদ অনমনীয়

ব্রিগেডিয়ার খালেদকে নিবৃত্ত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে মেজর ডালিম বঙ্গভবনে যেয়ে জানতে পারলেন যে কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদ প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন এবং তার অপেক্ষা করছেন। সেখানে জানা গেলো যে, মেজর হাফিজ ও ক্যাপ্টেন ইকবাল ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সব troops in withd raw করে বঙ্গ

www.pathagar.com

ভবন থেকে নিয়ে গেছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক troops movement হচ্ছে।

বঙ্গভবনে জেনারেল ওসমানীও এসে গেলেন। মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাও পৌঁছলেন। মেজর ডালিম গৃহযুদ্ধ থেকে সেনাবাহিনীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে আলোচনার জন্য নিজেই ক্যান্টনমেন্টে যেতে চাইলেন। জেনারেল ওসমানী এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কর্নেল রশীদ মেজর ডালিমের সেনা সদরে যাওয়া নিরাপদ মনে না করা সত্ত্বেও ডালিম মেজর নূরকে নিয়ে মধ্যরাতেই গেলেন।

এ রাতটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সারারাত মেজর ডালিম ও মেজর নূরের তৎপরতা চললো। প্রথম মেজর হাফিজের সাথে তারা দেখা করলেন। ডালিমের ভাষায়ই শুনুন ঃ

"-এ কি করলে হাফিজ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে?

-অঘটন বলছো কেন? জিয়া এবং মুশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছো না কেন? Both of them are betraying our cause. উল্টো প্রশ্ন করলো হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কাল বিলম্ব না করে ভেঙে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার এর মাধ্যমে সেনাপরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবো আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত reservations আছে; সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না, কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চিফ হবার lifelong ambition fulfill করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে more efficiently কাজ করানো যাবে।

-দেখো হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরূপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মুশতাকের জন্য। শুধু তাই নয়; অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে to stage back and reverse the process সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; আমার ধারণা, এ সমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে, কারণ যে অঘটন কখনোই সম্ভব হতো না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাবো। এরপর যা হবার তা হবে। কি যেন ভাবলো হাফিজ, এরপর বললো,

-ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে। হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে

www.pathagar.com

বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

-আরে এসো এসো, welcome, আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই। তার কথা শেষ হতেই বললাম,

-শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

-What do you mean? It's not my doing. Believe me Dalim it is theirs doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution at the sametime he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore, they want a change.

-বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সংকট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

No no not at all. I don't want to be the Chief. Believe me. I have no such ambition. ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি।

-যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয়; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশিদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গ ভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা? আমার কথার ধরনে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো হাফিজ। সে নিচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বললো। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন, তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।" (পৃষ্ঠা : ৫২৮-৫২৯)

ডালিম-খালেদ আলোচনা

মেজর ডালিমের সাথে ব্রিগেডিয়ার খালেদের এ আলোচনার ফলেই সেনাবাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হলো এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ ৩ নভেম্বর বিনা বাধায় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেন। ঐ আলোচনার বিবরণ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাই সংক্ষেপে হলেও ডালিমের গ্রন্থ থেকেই পরিবেশন করছি ঃ

"স্যার, কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই, জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের

www.pathagar.com

কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে you have to give me your explicit assurance. বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

-Be rest assured. no harm would be done to him. At the most he may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that.

আলোচনা শুরু হলো। একদিকে আমি ও নূর অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

-দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরনের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

-We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present Parliament is the parliament of Awami-Baksalites. জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

-তারপর?

-We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.

-দেশ চালাবে কে? প্রশ্ন করলাম।

-We shall form a 'Revolutionary Council. ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিলো। কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

-Khandakar Mushtaq will hand-over power to the Chief justice. ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন

-Continuation must be maintained and therefore. Khandaker Mushtaq will remain as the President but three Chiefs must be removed.

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না, কোন নির্দিষ্ট blue print ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতানৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের।" (পৃষ্ঠা : ৫৩০ ও ৫৩১)

আলোচনায় বিরতির পর আবার শুরু

রাত শেষ হয়ে ৩ নভেম্বর সকালেও আলোচনা অব্যাহত থাকাকালে নাস্তা প্রস্তুত বলে খবর আসলে নাস্তার পর আবার আলোচনা শুরু হলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন, ডালিমের লেখায় ঃ

"তুমি অযৌক্তিকভাবে সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছো। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র আমি একা দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মুশতাক এবং জিয়ার উপর বিতশ্রদ্ধ; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বলেই ব্রিগেডিয়ার

www.pathagar.com

খালেদ কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

-জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নেবেন স্যার? আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

-তুমি কি মনে করো চিফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি? (পৃষ্ঠা : ৫৩২)

-ডালিম, আমাদের দাবি চারটি ঃ

১. খন্দকার মুশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২. বর্তমানের তিন চিফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চিফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভিতে।

৩. আর্মিতে Chain of command re-establish করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে deployed সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪. বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

-ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক। আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

-ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতিনিধি পাঠানো হবে। জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

-আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি। (পৃষ্ঠা : ৫৩৫)

আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust

www.pathagar.com

and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir? আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হলো, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবে আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৬)

বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কামরায়

বঙ্গভবনে পৌঁছে ব্রিগেডিয়ার খালেদের দু'জন প্রতিনিধিকে অন্যত্র বসিয়ে মেজর ডালিম ও মেজর নূর প্রেসিডেন্টের কামরায় গেলেন। সেখানে জেনারেল ওসমানী, কর্নেল রশীদ ও মেজর হুদা ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ৪-দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনার পর করণীয় সম্পর্কে একমত হয়ে খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়কে ডেকে আনা হলো। প্রেসিডেন্ট মুশতাক জানতে চাইলেন (ডালিমের গ্রন্থ থেকে) ঃ

"-বলো, তোমাদের কি বলার আছে? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদদের তরফের দাবিগুলো একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন। সবকিছু শুনে খন্দকার মুশতাক ধীরস্থিরভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন, .

-Well I have heard you patiently. Go back and tell the people at the cantonment. 'if they want me to continue as the president then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prepared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadier. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to come-over to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normality in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয়; তবে তাকে বলবে he should come-over to Bangabhaban and take-over the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লাইনে যামুগা।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স-এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৮)

সেনা-সদরে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নিকট

বঙ্গভবন থেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়ের সাথে মেজর ডালিম ও মেজর নূর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলেন। সেখানে যা ঘটলো এর বিবরণ মেজর ডালিমের গ্রন্থে নিম্নরূপে পরিবেশন করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

"কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দকার মুশতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী জনাব মুশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাপা আক্রোশে ফেটে পড়লো সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন,

-How dare he speaks like that? তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

-Allright, we shall see. বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদচক্রের মূল সমস্যা ছিলো সেনাপরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে মুশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিলো খালেদচক্রের বাকশালপন্থি চেহারা উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

-ডালিম, খন্দকার মুশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না; সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

-জাস্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধানবিরোধী। তাছাড়া আইনের মানুষ হয়ে জাস্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপতি হতে সম্মত হবেন? জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

-well. যেভাবেই হোক না কেন; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাস্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হলো না কোন অদৃশ্য সুতার টানে তিনি এ ধরনের সংবিধানবহির্ভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৯)

মেজর ডালিম ও মেজর নূর ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়কে নিয়েই বঙ্গভবনে ফিরে এলেন। প্রেসিডেন্ট মুশতাক সব শুনে জাস্টিস সায়েমের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে মেজর মান্নাফ ও মেজর মালেক সন্তুষ্টচিত্তে এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে গেলেন।

৩ নভেম্বর দিবাগত রাত

মেজর ডালিমের গ্রন্থ থেকে জানা গেলো যে, খন্দকার মুশতাক আগস্ট-বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট সেনা অফিসারদেরকে সপরিবারে ব্যাংকক যাবার ব্যবস্থা করেন। ৩ তারিখ

www.pathagar.com

দিবাগত রাতেই প্রেসিডেন্ট মুশতাক খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ তার প্রতি-বিপ্লবে সহযোগিতা করার জন্য মেজর ডালিমকে অনুরোধ করায় ব্যাংকক রওয়ানা হবার আগে মেজর ডালিম ফোনে খালেদকে যা বললেন তা তারই ভাষায় শুনুন ঃ

"-স্যার, আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তোবা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি: রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাবো আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে। আপনার সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হলো না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহপাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারবো; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে '৭১-এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপস করে জাতীয় বেঈমান হিসেবে পরিচিতির যে গ্লানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

-রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে যেতে চাচ্ছো কেন, সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেঁচেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা, এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর threat থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদচক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার কৌশলগত কারণেই ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম।" (পৃষ্ঠা : ৫৪২ ও ৫৪৩)

৩ ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ঃ এক প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয়

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বিনা রক্তপাতে সামরিক বিপ্লব সাধন করে জেনারেল পদবি নিয়ে সেনাপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু এর পঞ্চম দিনই রক্তাক্ত বিপ্লবে তিনি নিহত হলেন। ৩ থেকে ৭ নভেম্বরে যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটলো এর বিস্তারিত জানার প্রবল আগ্রহের কারণে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি বই পেয়ে গেলাম, যার লেখক ১৫ আগস্ট-বিপ্লব থেকে জিয়া হত্যা পর্যন্ত অনেক তথ্য দিন-তারিখ উল্লেখ করে লিখেছেন। তার পরিচয় জেনে আমি পরম আস্থার সাথে বইটি পড়লাম। তাই প্রথমে তার পরিচয় তুলে ধরছি, যাতে পাঠক-পাঠিকা পূর্ণ আস্থার সাথে তার লেখাকে গ্রহণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

তার লেখা বইটির নাম 'তিন সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা'। ২০০ পৃষ্ঠার এ বইটিতে ১৫ আগস্ট-বিপ্লব, ৩ নভেম্বর বিপ্লব ও ৭ নভেম্বর বিপ্লবের চিত্র তারিখ ওয়ারী লিখেছেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখের জিয়া হত্যা ও জেনারেল মঞ্জুরের ব্যর্থ বিপ্লবের বিবরণও দিয়েছেন।

লেখক লে. কর্নেল (অব.) এম.এ হামিদ। তিনি সেনাবাহিনীতে জিয়াউর রহমান ও শফিউল্লাহর সাথে একই ব্যাচে যোগদান করেছেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ১৯৭২ সালে পালিয়ে এসে সেনাবাহিনীতে মিলিটারি সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকার স্টেশন-কমান্ডার থাকাকালেই ঐ তিনটি সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ৭ নভেম্বরের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাকে ঢাকার লগ এরিয়ার কমান্ডার নিয়োগ করেন। সেনানিবাসে তার বাসা থেকে জিয়াউর রহমানের বাসা মাত্র ২০০ গজ দূরে ছিলো। ব্যাচমেট হিসেবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো তারা তুই-তুমি সম্বোধন করতেন। লগ এরিয়া কমান্ডার নিযুক্ত হবার তিন মাস পরই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

লে. কর্নেল হামিদের আরও উল্লেখযোগ্য পরিচয় আছে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা দাবাড়ু রানী হামিদ তারই স্ত্রী এবং বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার কায়সার হামিদ তার সন্তান। তিনি নিজেও ছাত্রজীবন থেকেই যোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। এখনও তিনি ক্রীড়া সংগঠক।

তার বইটির পরিচয়

তার লেখা আলোচ্য বইটি পড়ে আমার বহুদিনের তৃষ্ণা মিটলো। বই থেকে লেখকের মন-মানসিকতা সম্বন্ধে ধারণা করা আমার অভ্যাস। এ ব্যাপারে আমার নিজের উপর আস্থা রয়েছে যে, আমার ভুল হবার কথা নয়। তিনটি অভ্যুত্থানের যে বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন তা যথার্থ বলে আমার বিশ্বাস। তিনি জিয়া হত্যা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। আমার মতো জানবার আগ্রহীদের জন্য বইটি অত্যন্ত জরুরি। যারা বইটি পড়তে চান তাদের জন্য বইটির প্রাপ্তিস্থান জানাতে চাই। বইটির ৪র্থ বর্ধিত সংস্করণ নতুন প্রকাশক ছেপেছেন। লেখক পূর্বের ৩টি সংস্করণই বাতিল ঘোষণা করেছেন। হাসি প্রকাশনী, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০। একমাত্র পরিবেশক : হিমি বুকস এন্ড বুকস, ঠিকানা- ঐ।

বইটিতে লেখকের ভূমিকা

যেসব তথ্যের জন্য আমি বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং কারো কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাদের তুলনায় এ বইটির তথ্যের উপর আমার বেশি আস্থার কারণ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট জানাবার উদ্দেশ্যেই বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করছি ঃ

"১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানগুলোর উপর আমার লেখার সুবিধা হলো, ওই সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি ছিলাম ঢাকা স্টেশন-কমান্ডার। সে হিসেবে অত্যন্ত কাছ থেকে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। এছাড়া অভ্যুত্থানের প্রধান নায়কদের প্রায় সবার সাথে ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সরাসরি জানাশোনা।

www.pathagar.com

অভ্যুত্থানের সর্বাধিক আলোচিত নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমার কোর্স-মেট। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আমরা দুই বছর একসাথে ক্যাডেট হিসেবে অধ্যয়ন করি। সে ছিলো আমার বন্ধু। তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো 'তুই তুকারের'। তাই আমার আলোচ্য বইতে অনেক সময় 'তুমি' সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে; বস্তুত এটাই ছিলো আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু হলেও বহুক্ষেত্রে তার ও আমার মত আর নীতির মিল ছিলো না। বিভিন্ন ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এমনকি গালাগালি চলতো। দুঃখের বিষয় স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী একটি মহলের প্ররোচনায় লগ এরিয়া কমান্ডার থাকাকালীন সময়, তার সাথে সিরিয়াস ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। যার ফলে হঠাৎ করেই আমি স্বেচ্ছায় সসম্মানে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসি।

বরাবরই জিয়া ছিলো মেজাজী এবং প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন সৎ ও সচেতন অফিসার। কিন্তু সে অসৎ অফিসারদের কানে ধরে কাজ করাতে সুবিধা হয় বলে মনে করতো। তার সাথে জেনারেল ওসমানী, মুশতাক আহমদ, জেনারেল খলিল প্রমুখদের বনিবনা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সবার সাথে একা লড়াই-ফাইট করে উপরে উঠে আসে তা ছিলো অবিশ্বাস্য ব্যাপার, লিডারশীপ কোয়ালিটির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

জেনারেল এরশাদ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন একজন অখ্যাত দুর্বল প্রকৃতির অফিসার। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই ছিলেন একমাত্র অফিসার, যার দুর্বলতাই হয়ে দাঁড়ায় তার ঊর্ধ্বে ওঠার বড় 'প্লাস পয়েন্ট'। তিনি কোহাটের অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাস করা একজন 'অনিয়মিত' অফিসার ছিলেন। বহু পরে নিয়মিত হন। জেনারেল এরশাদ ও আমি একসাথে ১৯৬৭ সালে কোয়েটার স্টাফ কলেজ কোর্সে অধ্যয়ন করি। দক্ষ স্মার্ট অফিসার হলেও তার নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য জাতিকে বহু মূল্য দিতে হয়। সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম ফসল জেনারেল এরশাদ। যিনি জিয়াউর রহমানের বদান্যতায় তড়িৎ প্রমোশন পেয়ে হন জেনারেল এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। অতঃপর আকাশ হলো তার সীমানা।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কথাবার্তায় চাল-চলনে রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। আমার কিছু জুনিয়র থাকায় তার সাথে সম্পর্ক থাকলেও তত ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। অন্যান্যদের মতো তিনিও ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি সদয় ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ, নেহায়েত দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে অকালে সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারান।

জেনারেল শফিউল্লাহ নম্র, ভদ্র অফিসার। সেও আমার কোর্স-মেট। আগস্ট অভ্যুত্থানের আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহ সামাল দিতে না পারায় সমালোচিত হয়। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ আগস্ট '৭৫ তারিখে শফিউল্লাহকে সরিয়ে তার স্থলে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হয়।

আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক মেজর ফারুক ও মেজর রশীদ ছিলো অনেক জুনিয়র অফিসার। তাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সব সময় তারা আমাকে

www.pathagar.com

শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। ফারুক-রশীদই প্রকৃতপক্ষে জিয়াকে সেনাপ্রধানের গদিতে বসায়, কিন্তু পরে জিয়া তাদেরকে এড়িয়ে চলায় তাদের ক্ষোভের অন্ত ছিলো না। ফারুক খুবই স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আবেগপ্রবণ অফিসার। রশীদ ছিলো ধীর, শান্ত ও হিসেবী।

কর্নেল তাহেরও ছিলো আমার অনেক জুনিয়র, তাই সরাসরি তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তাহের ছিলো একজন দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ও কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সাথে ছিলো ভালো সম্পর্ক। এ তিনজনই কমবেশি বামঘেঁষা হলেও তারা ছিলো নীতিবান অফিসার। পরবর্তীতে জিয়ার সাথেও তাহেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শ্রেণীহীন সেনাবাহিনীর প্রবক্তা কর্নেল তাহেরই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে নভেম্বর সিপাহী-বিপ্লবের প্রধান স্থপতি। কিন্তু জিয়ার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তাকে প্রাণ দিতে হয়।

৭ নভেম্বর সিপাহী-বিদ্রোহের দিনগুলোই ছিলো সবচেয়ে কঠিন সময়। সিপাহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। সিপাহীদের দাপটে অফিসারদের পলায়ন ছিলো কল্পনাতীত ব্যাপার। এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনটি সেনা অভ্যুত্থানের সময়ই আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই সপরিবারে অবস্থান করে অরাজক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করি।

ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে এবং যেভাবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সেভাবেই যথাযথ বর্ণনা দিয়েছি। তিনটি সেনা-অভ্যুত্থানেরই বিভিন্ন দিক আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। আমার পক্ষ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনের কোন ত্রুটি রাখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সত্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছি।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলছি, সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করেছি। সত্যের খাতিরে ঘটনাগুলো যথার্থ বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে গিয়ে থাকে, তাহলে তা ঘটেছে আমার একান্ত অনিচ্ছায়। তাই তাদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

লেখকের নিরপেক্ষতা

লেখক ঘটনাবলির যে বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যি নিরপেক্ষভাবেই দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু তিনি আগস্ট-বিপ্লবের যে পর্যালোচনা করেছেন, তাতে বিপ্লবের বিপক্ষ বলে পাঠকের মনে হতে পারে। কারণ তিনি ৭৯ থেকে ৮৫ পৃষ্ঠায় যে পর্যালোচনা করেছেন তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি শেখ মুজিবকে 'একজন মহান জনপ্রিয় নেতা' হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'তার ভাগ্যে এ রকম একটি মৃত্যুই কি জাতির কাছ থেকে প্রাপ্য ছিলো?'

পর্যালোচনায় তিনি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াত জামিল ইচ্ছে করলে জুনিয়র অফিসারদের বিদ্রোহ দমন করে বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হতেন। কেন তারা কিছুই করলেন না সে প্রশ্নও তিনি তুলেছেন।

www.pathagar.com

লেখক বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, 'অবাক ব্যাপার! তার করুণ মৃত্যুতে কোথাও টুশব্দটি উচ্চারিত হলো না। তার বিশাল জনপ্রিয়তা হঠাৎ কোথায় যেন হাওয়ায় উড়ে গেলো। কেন তার মৃত্যুতে জনতার বিপ্লব হলো না? কেন জনতার প্রতিরোধ গড়ে উঠলো না?" এ কথাগুলোর মধ্যে শেখ মুজিবের প্রতি সুস্পষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। শেখ মুজিবের এ মৃত্যু ব্যতীত স্বৈরশাসন থেকে জনগণকে মুক্তির আর কোন পথই ছিলো না। সে দিকটা লেখক বিবেচনা করেননি। একজন নিষ্ঠাবান সেনা অফিসার হিসেবে জুনিয়র অফিসারদের এ সেনা-বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। এর ফলে সেনাবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং পরে বহু যোগ্য দেশপ্রেমিক অফিসার নিহত হয় এর জন্য তিনি বেদনাবোধ করেন। এ দিক দিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বলা না গেলেও তথ্যাবলির পরিবেশনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে মনে করা যায়।

বিপ্লবের তথ্যাবলির উৎস

ইতঃপূর্বে আগস্ট-বিপ্লবী মেজর ডালিম ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর লেখা গ্রন্থদ্বয় থেকে তিনটি বিপ্লব সম্পর্কে তাদের অনেক উদ্ধৃতি কয়েক কিস্তিতে পরিবেশন করেছি। লে. কর্নেল আবদুল হামিদের লেখা বইটিতে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে জিয়া হত্যা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের কোন্দলের বিস্তারিত তথ্য বইটি থেকে জানা গেল। আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম। সকল ঘটনার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার যাবতীয় তথ্য যোগাড় হয়ে গেলো। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা পরিবেশন করতে চাই।

আগস্ট-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়ই ৩ নভেম্বর বিপ্লব

আগস্ট-বিপ্লবের পর সর্বস্তরের জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও কোন অস্থিরতা দেখা দেয়নি। প্রেসিডেন্ট মুশতাক জনগণের নিকট যে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনী সময়সূচি পেশ করেছেন তা রাজনৈতিক মহলে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। যদি সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার প্রতিযোগিতা না হতো তাহলে দেশে দু'এক বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়ে যেতো। জুনিয়র অফিসারদের নেতৃত্বে আগস্ট-বিপ্লব সফল হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট মুশতাক যদি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আস্থায় নিয়ে বিপ্লবী জুনিয়র অফিসারদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন তাহলে হয়তো সেনা-অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দল এতোটা প্রকট হতো না।

১৫ আগস্টের পর সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে কেন ও কিভাবে বিভেদ এবং কোন্দল সৃষ্টি হলো এবং ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ কেমন করে ক্ষমতা দখল করলেন, অতঃপর কেন ৭ নভেম্বর তিনি সৈনিকদের হাতে নিহত হলেন—এসব নাটকীয় ঘটনার বিবরণ যা কর্নেল হামিদের বইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেখান থেকে তথ্য নিয়ে আমি নিজের ভাষায় লিখলেও সংক্ষেপ হবে না। তাই তার লেখাই সরাসরি পেশ করছি। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কতক বাক্য বাদ দিচ্ছি। এবার তারই ভাষায় পড়ুন, সাব হেডিংগুলোও তারই ঃ

www.pathagar.com

আগস্ট পরবর্তী অবস্থা

১৫ আগস্টের পর ঘটনাপ্রবাহ চলছিলো সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে। একটি সরকারের পরিবর্তন ঘটেছিলো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এ সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিলো সেনাবাহিনীর হাতেগোনা ক'জন জুনিয়র অফিসারের দ্বারা। এখানেই ছিলো ঘটনার যত গণ্ডগোল।

অগাস্ট অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিলো না। সেনাবাহিনীতে কোন সিনিয়র অফিসার সরাসরি এতে জড়িত ছিলেন না। আর্মির মাত্র দুটি ইউনিট, দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি এবং বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাংক রেজিমেন্ট) ছাড়া অন্য কোন ইউনিট অর্থাৎ যারা সেনাবাহিনীর মূল বাহিনী, তাদের কোন ইউনিট জড়িত না থাকায় তথাকথিত ঐ অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা নিয়ে ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিল অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কারণ ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যান্ত্রিক দুটি ইউনিট সরকার উল্টিয়ে দিলো, আর তারা বসে বসে শুধু ঘাস কর্তন করলেন। এটা ছিলো চরম অপমানের নামান্তর।

খন্দকার মুশতাক আহমদ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বঙ্গভবনে তাঁকে ঘিরে তখন জেঁকে বসে আছে অভ্যুত্থানের নায়ক তরুণ মেজররা। প্রকৃতপক্ষে মেজর ফারুক, রশীদই তখন সর্বময় কর্তা। মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, পাশা, রাশেদ প্রমুখ জুনিয়র অফিসাররা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকে। সিনিয়র অফিসারদের এড়িয়ে জুনিয়র অফিসারদের কর্মকাণ্ড স্বভাবতই সিনিয়রদের পছন্দ হয়নি। এসব ব্যাপারে আর্মির সাধারণ ডিসিপ্লিনের প্রতি ছিলো মারাত্মক হুমকি। উর্ধ্বতন হেড কোয়ার্টারের অনুমতি ব্যতিরেকেই ফারুক-রশীদ আক্রমণাত্মকভাবে বেঙ্গল-ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশেপাশে স্থাপন করে। আর্টিলারি ইউনিটের কামানগুলোও সেখানে ছিলো।

আগস্ট অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে দ্রুত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসলেও ক্যান্টনমেন্টে সামরিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। বিভিন্ন অজুহাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগলো।

মেজর রশীদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার। তিনিই প্রেসিডেন্ট এবং সেনাবাহিনী প্রধানের মধ্যে যোগাযোগ রাখছিলেন। এসব ব্যাপার মোটেই সহ্য হচ্ছিলো না অনেক সিনিয়র অফিসারের। এদের মধ্যে ছিলেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল এবং সি. জি. এস. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তারা জিয়াকে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন, অভ্যুত্থানের মেজরদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

ভগ্নহৃদয় খালেদ

খুবসম্ভব পঁচাত্তরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাকে তার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জিয়াকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান তো ছিলোই, সেটা জিয়া আগেই জানতেন। এবার মাঝখান থেকে খালেদ মোশাররফের মনটা খারাপ হয়ে গেলো, কারণ শফিউল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত তারই হওয়ার কথা ছিলো।

www.pathagar.com

তার আশা ভঙ্গ হলো, এখন তাকে আরো তিনটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নাখোশ শাফায়াত জামিল। তাকে কদলী দেখিয়ে তারই অধীনস্থ অফিসার মেজর রশীদ ও জুনিয়র মেজররা বঙ্গভবনে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন। অথচ চার হাজার সৈন্য নিয়ে সে নাকি ঢাকার স্বাধীন সক্রিয় ব্রিগেড কমান্ডার।

মনের গভীরে প্রবল চাপা ক্ষোভ তাদের দু'জনকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো। খালেদ-শাফায়াত দু'জনই একটা কিছুকে 'ইস্যু' করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

নাখোশ জিয়া

কিন্তু জিয়ার অবস্থাও ছিলো নড়বড়ে। চতুর খন্দকার মুশতাক জেনারেল ওসমানীকে তার সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। একই সাথে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে 'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' করে জিয়ার উপরে স্থান দিলেন। মুশতাক সামরিক ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীকেই প্রাধান্য দিতেন। জিয়াকে পাত্তা দিতেন না। সরাসরি কথাও বলতেন না। এতে জিয়া ভিতরে ভিতরে প্রেসিডেন্ট মুশতাকের উপর খুবই নাখোশ ছিলেন। এছাড়া জেনারেল ওসমানী ও খলিলুর রহমানের সাথেও জিয়ার এমনিতেই বনিবনা ছিলো না। অথচ মুশতাক এদের কিনা তার উপরে স্থান দিয়ে তার ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

এ সময় আমি ছিলাম ঢাকার স্টেশন কমান্ডার। এই সুবাদে প্রায়ই জিয়ার সাথে এসব নিয়ে বন্ধুসুলভ কথাবার্তা হতো। তার অফিসে গেলেই জিয়া রাগে গরগর করতো। ওসমানী ও খলিলুর রহমানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করতো। আমাকে কয়েকবার ওসমানীর কাছে গিয়ে সরাসরি বুড়োকে সরে দাঁড়াবার কথা বলতো। আমি শুধু হেসে তার রাগ থামাবার চেষ্টা করতাম। জিয়ার অবস্থা তখন খাঁচাবন্দি ব্যাঘ্রের মতো।

খালেদ মোশাররফের রাজনৈতিক শক্তি ছিলো তার ভাই রাশেদ মোশাররফের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ। নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিনের সাথেও তার আলাপ ছিলো। শাফায়াত জামিলের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু শাফায়াত আবার জিয়াউর রহমানের সাথেও সমান সম্পর্ক রাখতো। অর্থাৎ সে এদিকেও ছিলো, ওদিকেও ছিলো।

প্রথম দিকে শাফায়াতের সাথে রশীদের সম্পর্কও ছিলো খুবই ভালো। রশীদ ছিলো শাফায়াতেরই অধীনস্থ ইউনিটের কমান্ডার। কিন্তু 'ক্যু' করার পর সে তার 'বস'-কে টেক্কা দিয়ে নিজেই বঙ্গভবনের মসনদে বসে পড়লো। তার সাথে 'ক্যু'র অন্যান্য মেজররা—ফারুক, ডালিম, নূর, হুদা, পাশা, রাশেদ প্রমুখ। এখান থেকেই শুরু হয় যত গণ্ডগোল। এ রকম অবস্থা ছিলো শাফায়াতের কাছে রীতিমতো অপমানজনক। চার হাজার সৈন্যের স্বাধীন পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে সে বসে থাকবে ক্ষমতাসীন হয়ে, আর বঙ্গভবনে চুনোপুটি মেজররা করবে দেশ শাসন—এটা অসম্ভব। মেজরদের উৎখাত, আর 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এবার এক প্লাটফরমে এসে দাঁড়ালেন শাফায়াত জামিল ও খালেদ মোশাররফ। তারা প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি শুরু করলেন। তারা জিয়াকে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

www.pathagar.com

আসলে জিয়া সার্বিক ব্যাপারটা দেখছিলেন অন্যভাবে। তিনি দেখছিলেন, মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনলেই তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 'মুশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র' ধূলিসাৎ করতে না পারলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। এটাই ছিলো ঐ মুহূর্তে জিয়ার সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ। অতএব তিনি তার আপন পরিকল্পনায় কাজ করছিলেন। গোপনে, অতি সন্তর্পণে। তাহের, খালেদ, শাফায়াতরাও বসে ছিলেন না। সবাই তখন ক্ষমতার মোহে ছিলো আচ্ছন্ন। তারাও নিজ নিজ ছক অনুযায়ী কাজ করছিলো।

এই সময় জিয়ার সাথে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হতো। বিকেলে টেনিস কোর্টেও দেখা হতো। আমি তাকে সেনানিবাসের আকাশে ঝড়ের সংকেত উপলব্ধি করতে বারবার অনুরোধ করি। কিন্তু বার বার তার একই জবাব, "হামিদ, Wait and see. এক মাঘে শীত যায় না।" আমি তার এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। তাকে তার অফিসে গিয়ে বার বার বলি। সে ঘাড় কাত করে অবহেলা ভরে কেবল মুচকি হাসে, চোখ টিপে আর একই উত্তর দেয়, "হামিদ বললাম তো, এক মাঘে শীত যায় না।" আমি বিব্রত হই।

আমার কথার কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমি রাগ করে বেশ কিছুদিন তার অফিসে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। এ সময় জিয়ার জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বহু অফিসার আমার কাছে এই সময় এসে বলেছেন, "স্যার, আপনি তো তার বন্ধু মানুষ, কোর্সমেট। তাকে কেন বুঝিয়ে বলছেন না, বিপদ আসন্ন। এক্ষুণি তাকে সতর্ক হতে হবে।" আমি তাদের বলেছি, "ব্রাদার্স, ভেরি সরি, জিয়া আমার কথার কোন আমলই দিচ্ছে না। এতে তারা বড়ই নিরাশ হতেন।"

কর্নেল রশীদও আমাকে বলেছে, সেও জিয়াকে খালেদ-শাফায়াতের সম্ভাব্য অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তিনি কোন অ্যাকশন নিতে চাননি। এতে তার মনে তখনই জিয়ার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তার ধারণা হয়, জিয়া নিজেই তলে তলে কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছেন। গভীর জলের মৎস্য জিয়া। তার আসল মতলব রশীদ অথবা অন্য কেউ কিছুই বুঝতে পারছিলো না। আসলে ভিতরে ভিতরে চলছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি।

আসলেই কি জিয়া ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে তা মোটেই জানতেন না? পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে এর জবাব পাওয়া যাবে।

জিয়া এবং কর্নেল তাহের একে অন্যের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। উভয়ে একই সাথে একই সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাহেরকে পঙ্গুত্বের জন্য অবসর দেওয়ার পর জিয়া বরাবর তার সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তাহের গোপনে জাসদের আর্মস উইং গণবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জিয়াকে সামনে রেখে চাইনিজ পদ্ধতির সেনা-বিপ্লবের একটা স্বপ্ন দেখছিলেন।

চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল ছিলেন প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠ। তারা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেজরদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বললেন। কিন্তু জিয়া

www.pathagar.com

মেজরদের কাছে ছিলেন কৃতজ্ঞ, কারণ তারাই তো তাকে চিফ-অব-স্টাফ বানিয়েছে। অতএব, জিয়া কৌশলে একূল, ওকূল, দু'কূল রক্ষা করেই চলতে থাকেন। যাকে বলে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' এরকম একটা অবস্থার মধ্যদিয়ে চলছিলেন তিনি। জিয়া দুই প্রান্তের লোকজনদের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। একদিকে ফারুক-রশীদের পিঠ চাপড়ানো, অন্যদিকে শাফায়াত জামিলের কাঁধে হাত, দুই-ই করছিলেন। আসলে জিয়া বহুদিন গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করায় এসব কাজে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

জিয়া তলে তলে আর একটি কাজ করছিলেন। তা হলো, তিনি সবার অজ্ঞাতে জাসদের কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের আর্মস উইং ইতোমধ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। শেখ সাহেবকে উৎখাতের জন্য তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। জিয়া সবার অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সুহৃদ কর্নেল তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যান। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে একটি সেনাবিপ্লবের লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের সাথে তাদের রীতিমতো পাকাপাকি কথাবার্তা হয়। তার সাথে বেশ ক'টি গোপন মিটিং হয়। যদিও বিপ্লবের ব্যাপারে জিয়ার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের উর্ধ্বতন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, কিন্তু কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়িতে তারা জিয়ার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন।

জিয়া বনাম মুশতাক-ওসমানী

সত্যি বলতে কি খোদ জিয়াউর রহমানের আর্মির উর্ধ্বতন 'চেইন অব কমান্ড' মোটেই সহ্য হচ্ছিলো না। তিনি নিজেই তা ভাঙ্গতে চাচ্ছিলেন। তার মাথার ওপরে জেনারেল ওসমানী ও খলিলুর রহমানের মাতব্বরী মোটেই পছন্দ হচ্ছিলো না। তিনি চাচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনিই যেন সর্বেসর্বা থাকেন। বর্তমান অবস্থায় তার প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হলে দুটি ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়। খন্দকার মুশতাক আহমদও রগচটা লোক ছিলেন। জিয়াউর রহমান তাকে পছন্দ করতেন না। মুশতাকেরও জিয়াকে পছন্দ হতো না। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে সবাইকে এক খোঁয়াড়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মানিয়ে চলতে হচ্ছিলো। বলা যেতে পারে, ঐ সময় প্রেসিডেন্ট মুশতাক ও সেনাপ্রধান জিয়ার মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিলো মেজর রশীদ। মেজর রশীদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার (Chief Co-ordinator)। দু'একদিন পর পরই একগাদা ফাইল বগল দাবা করে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মুশতাকের কাছ থেকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কাছে আসতেন। আবার জিয়ার কাছ থেকে তার পয়েন্ট নিয়ে মুশতাকের কাছে যেতেন। সরাসরি জিয়া-মুশতাকের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা বা দেখা-সাক্ষাৎও হতো না। ওসমানীর সাথেও না। এভাবেই চলছিলো দৈনন্দিন কাজকর্ম।

বঙ্গভবনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য কামরাগুলোতে ক্যু'র মেজররা শক্তভাবে জেঁকে বসে দেশ শাসন করতে লাগলো। তারা নিজস্ব স্টাইলে বঙ্গভবনে একটি অঘোষিত সেক্রেটারিয়েট তৈরি করে বিভিন্ন দিকে নির্দেশ দিতে লাগলো। স্বভাবতই ক্যান্টনমেন্টের অফিসারদের এসব পছন্দ হচ্ছিলো না। কিন্তু মুশতাকও এসব অফিসারদের কিছু করতে পারছিলেন না, কারণ তারা ছিলো তার সূর্যসন্তান। তারাই তো একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের

www.pathagar.com

মাধ্যমে এই নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে বঙ্গভবন ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে মতানৈক্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হলো। জিয়াউর রহমান চুপচাপ, নীরব দর্শক। তার ভাবখানা ছিলো বাঘে-সিংহে লাগুক একটা টক্কর, তাহলে দু'গ্রুপেরই শক্তি ক্ষয় হবে। ফলে তারই সুবিধা হবে।

জুনিয়র মেজরদের সফল অভ্যুত্থান ক্যান্টনমেন্টের কিছু সিনিয়র, এমনকি জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতায় আরোহণের নতুন প্রেরণা যোগালো। সবাই একে অন্যকে ডিঙিয়ে, টেক্কা দিয়ে কেউ চিফ, কেউ প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো। দেশের সর্বোচ্চ পদটি তখন বন্দুকের নলের ধরাছোঁয়ার নাগালে বলে মনে হতে লাগলো।

রাজনৈতিক অবস্থা ততোদিনে যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণাও দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও কোথায় যেন অস্বস্তি ঠেকছে সবার। রাজধানীর 'উত্তর পাড়া' নিয়েই উদ্বিগ্ন সবাই। ওদিকে ঝড় উঠছে, সবার তাই আশঙ্কা। এ রকম একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্রুত এগিয়ে এলো ঘটনাবহুল মাস নভেম্বর।

অক্টোবর মাসে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে সামরিক অফিসারদের মধ্যে কোন্দল প্রবল হয়ে উঠলো। জিয়া এবং খালেদ গ্রুপের মধ্যে একটি মুখোমুখি সংঘাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। বঙ্গভবনে বসে ফারুক-রশীদরাও স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এই দু'গ্রুপের সংঘর্ষে তাদের অবস্থানেরও বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। সেনাপ্রধান জিয়াকে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি প্রতিপক্ষ গ্রুপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। এতে বঙ্গভবনে মুশতাক, ওসমানী, খলিল, রশীদ, ফারুক সবাই জিয়ার সততা নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের আশঙ্কা হয়, জিয়া কি নিজেই একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছে?" (পৃষ্ঠা : ৮৬-৯১)

২ নভেম্বর দিবাগত রাত

১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে দুটো বড় বড় ঘটনা ঘটে। একটা হলো মধ্যরাতে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়া। অপরটি হলো ঐ রাতের শেষ প্রহরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আওয়ামী লীগের চার শীর্ষ নেতার নির্মম হত্যা।

সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান পদাধিকারী চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তার ঊর্ধ্বতন পদাধিকারী সেনাপ্রধানকে তারই সরকারি বাসভবনে বন্দি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সূচনা করেন। কতক জুনিয়র অফিসার বঙ্গভবনে বসে দেশ শাসন করবে এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খন্দকার মুশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্টের গদিতে রেখেই তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধানের পদটি দখল করার সামরিক বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নেন।

সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মধ্যে এতো বেশি জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁকে বন্দি করার খবরে সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বঙ্গভবনে আগস্ট-বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ সেনাপ্রধানের বন্দি হবার খবর জেনে বুঝতে পারলেন যে, খালেদ মোশাররফ আগস্ট-বিপ্লবের পাল্টা বিপ্লব ঘটাবার ব্যবস্থা করছেন। তাহলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তাই

www.pathagar.com

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবপন্থি হিসেবে আওয়ামী লীগের যেসব শীর্ষ নেতা বন্দি ছিলেন, তারা যাতে ময়দানে খালেদ মোশাররফের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করতে না পারেন সে জন্যই তাদেরকে ঐ রাতেই শেষ প্রহরে হত্যা করা হয়। শেষ রাতের এতো বড় খবরটা ৩ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি বলে দেশবাসী, এমনকি সেনাবাহিনীও জানতে পারেনি।

রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ থাকায় গোটা দেশবাসী চরম অনিশ্চয়তা বোধ করে। প্রতি-বিপ্লবীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার অপেক্ষায় দেশ স্থবির হয়ে রইলো। সরকারি অফিস-আদালতও অচল অবস্থায় পড়লো। সর্বত্র থমথমে ভাব বিরাজমান।

৩ নভেম্বর সারাদিন আগস্ট-বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের সাথে খালেদ মোশাররফের সমঝোতায় কেটে গেলো। উভয় পক্ষই রক্তপাত এড়াবার পক্ষে থাকায় সমঝোতা হয়ে গেলো এবং আগস্ট-বিপ্লবীরা ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই দেশত্যাগ করলেন। জেল হত্যার খবর খালেদ মোশাররফ ৪ তারিখ সকালে জানতে পেরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ডিআইজি ই. এ. চৌধুরীকে শক্তভাবে চার্জ করলেন যে, আগে কেন এ খবর জানানো হলো না, জানলে ওদের কাউকে বিদেশে যেতে দেওয়া হতো না এবং বিচার করা হতো। খবর সরবরাহ বন্ধ থাকায় তারা জেল হত্যার একদিন পরও নিরাপদে বিদেশে চলে যেতে সক্ষম হলেন।

৪ নভেম্বর

আগস্ট-বিপ্লবের নেতারা বিদেশে চলে যাওয়ায় খালেদ মোশাররফ নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনি বিনা রক্তপাতে সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট মুশতাক পদত্যাগ করবেন বলে জানতে পেরে তিনি এক অফিসার পাঠিয়ে ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই জিয়াউর রহমান থেকে পদত্যাগ পত্র সংগ্রহ করে নিলেন। এখন প্রেসিডেন্ট তাকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দেবার পথে আর কোন বাধা রইলো না।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সকাল ১০ টায় বিজয়ীর ভাব নিয়ে বঙ্গভবনে প্রবেশ করলেন। তার সমর্থক আরও কতক সেনা অফিসার এবং সশস্ত্র সৈনিক বঙ্গভবন দখল করলেন। খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সামরিক মেজাজ দেখিয়ে সেনাপ্রধান জিয়ার পদত্যাগপত্র প্রেসিডেন্টের সামনে পেশ করে তাঁকে সেনাপ্রধান নিয়োগের নির্দেশ দিলেই হয়তো কাজ হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি সসম্মানে ভদ্রভাবে কাজ আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেন।

প্রেসিডেন্ট মুশতাক মন্ত্রিসভার বৈঠক ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করলেন। জেনারেল ওসমানীও প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করলেন। খালেদ সারাদিন বঙ্গভবনে দরকষাকষি করতে থাকলেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের অপেক্ষায় রইলেন।

ও দিকে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মনোভাবের কোন খবর বঙ্গভবনে বসে খালেদ টেরও পেলেন না। সে খবর কর্নেল হামিদের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"সারাদিন সেনা ছাউনির সর্বত্র একই জল্পনা-কল্পনা-আর্মি চিফ জিয়াকে কেন বন্দি করে রাখা হবে? এটা কোন্ ধরনের আর্মি? এসব কি ধরনের খেলা? অফিসারদের মধ্যে যদি

www.pathagar.com

ক্ষমতা নিয়ে এভাবে কাড়াকাড়ি চলে, তাহলে সিপাহীরা কোন দিকে যাবে? এটা কি ভারতীয় চক্রান্ত? খালেদ কি ভারতের চর? ধর্ম-কর্ম কি বন্ধ হয়ে যাবে? চলে ঢালাও কানা-ঘুষা। ক্যান্টমেন্টের ভিতরে বাইরে সর্বত্র অশুভ জল্পনা কল্পনা।

এখানে অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, মাত্র কিছুদিন পূর্বে সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হন, কিন্তু তার মৃত্যুঘটনা নিয়ে সৈনিকরা উত্তেজিত হয়নি, বিশেষ মাথাও ঘামায়নি, অথচ জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়ার ঘটনায় অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো প্রবল অসন্তোষ। দু'দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে দারুণ অনিশ্চয়তার ছাপ। সেনাসদরে গুঞ্জন। কাজকর্ম সব বন্ধ। অসন্তোষ চরমে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো, জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। চাপের মুখেই তা করেছেন। একখানা সাদা কাগজে তার স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পত্রে দস্তখত নেওয়া হয়েছে। একই পত্রে পেনশনের আবেদন করেছেন। খালেদের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার রউফ তার কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসেন। গৃহবন্দি জিয়া পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে জিয়ার প্রতি সবার সহানুভূতি আরও বেড়ে গেলো।" (পৃষ্ঠা : ১০০)

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক কর্নেলের হুমকিতে খালেদ ক্ষমতা পেলেন

৪ তারিখ সারাদিন বঙ্গভবনে দেন-দরবার ও আলাপ আলোচনা চলছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ ভবনে অস্ত্রধারী উর্দিপরা বিভিন্ন মতবাদের অফিসারদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের শলা-পরামর্শ চলছে। উন্মুক্ত পিস্তল ও স্টেনগান কাঁধে তরুণ অফিসারদের আনাগোনা।

প্রেসিডেন্টের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী, বিমান বাহিনী প্রধান তোয়াব, নৌ বাহিনী প্রধান এম.এইচ. খান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল খলিল ও সেনাপ্রধান পদপ্রার্থী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে উপস্থিত।

উত্তপ্ত পরিবেশে প্রেসিডেন্ট মুশতাক ২৬ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার বৈঠক করছিলেন। বৈঠকে জেল হত্যার তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। খালেদ মোশাররফ, তোয়াব ও এম.এইচ. খান ভেতরে এসে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে মন্ত্রীরা গলাখুলে বলতে থাকেন।

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের অন্যতম নেতা ৪র্থ বেঙ্গলের ৪ হাজার সৈনিকের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল আশা করেছিলেন যে, সকাল ১০ টায় খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে আসার পরই তিনি সেনাপ্রধান হয়ে সেনাসদরে ফিরে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিপ্লবের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা শুরু করবেন। বঙ্গভবনে দেন-দরবারে সারাদিন কেটে যাওয়ায় কর্নেল শাফায়াত অস্থির হয়ে গেলেন। ফোনে খালেদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে কর্নেল মালেককে নিয়ে তিনি সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ছুটে গেলেন। উত্তেজিত অবস্থায় বঙ্গভবনে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় খালেদ মোশাররফ? সবাই বললেন, তিনি কেবিনেট রুমে মিটিং এ আছেন। এর পর যা ঘটলো কর্নেল হামিদের লেখায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

সশস্ত্র শাফায়াতের অনুপ্রবেশ

যখন মন্ত্রিসভায় উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা চলছিলো, তখন ঘটে গেলো এক নাটকীয় কাণ্ড। আকস্মিকভাবে সজোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন ডাণ্ডা হাতে কর্নেল শাফায়াত জামিল। পিছনে স্টেনগান হাতে সশস্ত্র অফিসার। ভীত-সন্ত্রস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। তারা আসন ছেড়ে ছুটে পালাতে উদ্যত। মেজর ইকবাল (পরবর্তীতে মন্ত্রী) খন্দকার মুশতাকের দিকে স্টেনগান তাক করে বলতে থাকেন, আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার দেখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর দেখেননি। এখন দেখবেন। ওসমানী অসম সাহসের সাথে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, খোদার ওয়াস্তে গোলাগুলি করবে না। তোমরা এসব পাগলামি বন্ধ করো। বেঁচে গেলেন মুশতাক। উত্তপ্ত মুহূর্তে উন্মুক্ত স্টেনগান যে কোন সময় গর্জে উঠতে পারতো। বঙ্গভবন চত্বরে ৩২ নম্বর রোডের রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে থেমে গেলো।

শাফায়াত জামিল খন্দকার মুশতাকের পদত্যাগ দাবি করে বললেন, আপনি একজন খুনি। আপনি জাতির পিতাকে খুন করেছেন। আপনার সরকার অবৈধ। আপনার ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। আপনাকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে। মুশতাক মাথা নেড়ে তখনই রাজি হলেন।

এই সময় শাফায়াত মুশতাকের সাথে বেশ রূঢ় ব্যবহার করে। ওসমানী প্রতিবাদ করে বলেন, ওনার সাথে অশোভন ব্যবহার করা ঠিক হবে না। খোদার ওয়াস্তে তোমরা এসব বন্ধ করো। রক্তপাত ঘটিও না। শাফায়াত বললো, 'আপনি চুপ থাকুন। আপনি উপদেষ্টা হিসেবে এতোদিন কি উপদেশ দিয়েছেন?'

জেনারেল খলিল প্রতিবাদ করে বলেন, "দেখো, ওনাকে এভাবে অপমান করা উচিত হবে না। দয়া করে শান্ত হও।" শাফায়াত জামিলের চিৎকার, "আপনি চুপ থাকুন। আর কথা বলবেন না। আপনি জেল হত্যার কথা জানতেন, তাও ওদের যেতে দিয়েছেন। আপনাকেও অ্যারেস্ট করা হলো।" শাফায়াত এই সময় উত্তেজিত। আর তার অফিসাররা শুধু সংকেতের অপেক্ষায়।

শাফায়াত যখন উত্তেজিতভাবে ভেতরে ঢোকে, তখন খালেদও মিটিং-এ বসেছিলো। উত্তপ্ত পরিবেশ, নাজুক পরিস্থিতি। জেনারেল ওসমানী উঠে তখন শাফায়াত, খালেদকে এবং অন্যান্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই সময় কেবিনেট মিটিং-এর পরিবেশ সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায়। এক সময় কর্নেল মালেক শাফায়াতকে বুঝিয়ে কোনক্রমে কক্ষের বাইরে নিয়ে যান। সবাই এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মন্ত্রিসভার কার্যক্রম আবার শুরু করা হয়।

ওসমানী তাদের বললেন, তোমাদের যা যা প্রস্তাব তা মিটিং-এ বলে যাও। মিটিং-এ সবই পাস করা হবে। অতঃপর কর্নেল এম.এ. মালেক ভেতরে ঢুকলেন। তিনি পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো।

১. মুজিব হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে।

২. খালেদ মোশাররফকে 'চিফ অব স্টাফ' নিযুক্ত করা হবে।

www.pathagar.com

৩. মুশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন, যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা হয়। তবে তিনি অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করবেন বলে সম্মত হন।

৪. বঙ্গভবন থেকে সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক চললেও তখন খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল পালাক্রমে ঘোরাফেরা করে পয়েন্ট দিচ্ছিলেন। বন্দুকের নলের মুখে ঐ সময় বেশ কিছু কাগজপত্রে মুশতাকের জবরদস্তি সই নেওয়া হয়। দীর্ঘরাত পর্যন্ত মিটিং চললো। রাত্রি প্রায় ২টায় মিটিং শেষ হলে কর্নেল মালেক মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভদ্রলোকগণ, ৪ জন ছাড়া আপনারা বাকি সবাই বাসায় ফিরে যেতে পারেন।"

সর্বনাশ! এটা আবার কোন্ নির্দেশ? চার নেতা তো শেষ। এবার কোন চারজন? সবাই চমকে উঠলেন! শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জু। তারা ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। বাকিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বঙ্গভবন ত্যাগ করে নিজ নিজ বাসার দিকে ছুটে চললেন। যমদূতের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন, এটাই তো আল্লাহর অসীম রহমত।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী প্রধান করা হলো। এয়ার মার্শাল তোয়াব ও অ্যাডমিরাল এম. এইচ. খান হাস্যরত খালেদের কাঁধে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পরিয়ে দিলেন। পরদিন বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার প্রথম পাতায় হাস্যরত খালেদের ছবিটি ছাপানো হয়। দুর্ভাগ্য খালেদের! মাত্র ৭২ ঘন্টা তিনি মেজর জেনারেলের র‍্যাংকটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘ ম্যারাথন মিটিং-এর পর ক্লান্ত শ্রান্ত বিধ্বস্ত মুশতাক, রাত তিনটায় বঙ্গভবনে তার শোবার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তার এবং তার মন্ত্রিসভার শেষ মুহূর্ত। বর্ষীয়ান উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী তার সাথে কোলাকুলি করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ওসমানী বললেন, Sorry oldman, We played a bad game. Let us forget and forgive.

গভীর রাত। ওসমানী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তার বাসায় যাওয়ার গাড়ি নাই। বললেন, এখন আমি আর ডিফেন্স উপদেষ্টা নই। সুতরাং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবো না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল মালেক এগিয়ে এসে বললেন, 'স্যার আপনি আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবো। ওসমানী তার গাড়িতে করেই গভীর রাতে বাসায় ফিরলেন।" (পৃষ্ঠা : ১০৩ ও ১০৪)

আওয়ামীপন্থিদের মিছিলের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া

৪ নভেম্বর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থক একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একটি নাগরিক শোক মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মিছিলে খালেদ মোশাররফের ছোট ভাই ও বৃদ্ধা মাতা শরীক থাকায় খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগপন্থি বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। এ খবরে ৪ তারিখ দিবাগত রাতেই গোটা ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন পত্রিকায় মিছিলের ছবি ও খবর বের হয়। জনগণের মধ্যে এ ধারণা জন্মে যে, আগস্ট-বিপ্লবের বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। জনগণ আগস্ট-বিপ্লবের পক্ষে থাকায় জনমত স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষুব্ধ হয়।

www.pathagar.com

সেনা-ছাউনিতে সন্ধ্যার পর থেকে মাইকে প্রচার হতে থাকে, "দেশ ভারতের দখলে গেলো, ভারতীয় সৈন্যরা প্রস্তুতি নিচ্ছে।" সৈনিকদের মধ্যে প্রচারপত্রও বিলি হলো। তাতে লেখা ছিলো "খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে, অফিসারদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই। অফিসারদের রক্ত চাই।"

পরে জানা গেলো যে, সেনাপ্রধানকে বন্দি করায় সৈনিকদের মধ্যে যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় তা কাজে লাগিয়ে জাসদপন্থি কর্নেল তাহের মাইক ও প্রচারপত্র বিলি করার ব্যবস্থা করেন। সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়া এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে না। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা লাভের দেন-দরবারে বঙ্গভবনে ব্যস্ত। আর এ দিকে সেনা-ছাউনিতে খালি ময়দানে কর্নেল তাহেরের ব্যাপক খালেদবিরোধী তৎপরতা চলে।

কর্নেল তাহেরের পৃথক বিপ্লব

সেনাপ্রধান জিয়াকে বন্দি করার প্রতিক্রিয়ায় সৈনিকদের মধ্যে অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল ক্ষমতা হাসিলের নেশায় মশগুল থাকা অবস্থায় সৈনিকদের মধ্যে ৩ থেকে ৫ তারিখের স্থবির পরিবেশে যে বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠলো তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করার জন্য কর্নেল তাহের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন।

এক জাসদ নেতা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পরও সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আর্মি হেড-কোয়ার্টারে অবাধে যাতায়াত করতেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি এক পা হারাবার কারণে তার প্রতি সবারই যথেষ্ট সহানুভূতি ছিলো। তাই সর্বত্রই তিনি সম্মান পেতেন এবং সকল সিনিয়র অফিসারের সাথে অবাধে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। এ সুযোগে কর্নেল তাহের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অফিসার ও সৈনিকদেরকে গোপনে সংগঠিত করার এমন কি সমাজতন্ত্রের প্রচার করারও সুযোগ গ্রহণ করতেন।

তিনি 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি গোপন সংগঠনও গড়ে তুলেন। 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র সংগঠনও তিনি জনগণের ময়দানে পরিচালনা করেন। জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে এবং সৈনিকদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের পরিকল্পনা নিয়ে কর্নেল তাহের অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেন। কর্নেল তাহেরের এ বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমেই জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান এবং খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

৫ নভেম্বরের অবস্থা

নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম আর্মি হেড কোয়ার্টারে ৫ তারিখ সকালে মিটিং করেন। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধান, রক্ষীবাহিনী প্রধান, ডি.জি.এফ.আই, আইন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এটরনি জেনারেলদের সাথে আলোচনা চলে। আইনগত দিক বিচার করে প্রেসিডেন্ট মুশতাক থেকে প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

ঐ দিনই রাত দশটায় জেনারেল খালেদ নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানদেরকে নিয়ে বঙ্গভবনে পৌঁছেন। খন্দকার মুশতাক থেকে পদত্যাগপত্র ও অন্যান্য আরও কতক কাগজ শেষবারের মতো সই করিয়ে নেন। রাত সাড়ে এগারোটায় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট পুলিশ প্রহরায় বঙ্গভবন থেকে বিদায় হয়ে তার আগামসী লেনের বাড়িতে ফিরে যান।

কর্নেল হামিদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ৫ তারিখ সারাদিন ক্যান্টনমেন্টে বিভিন্ন ইউনিটে সৈনিকদের গোপন বৈঠক চলে। সর্বত্র বিদ্রোহের উত্তাপ। কিন্তু খালেদ-শাফায়াত সম্পূর্ণ বেখবর। তারা ক্ষমতার নেশায় বিভোর। তারা টেরই পেলেন না, তাদের পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে।

অবশ্য ৫ তারিখের পত্রিকায় মিছিলের খবর পড়ে খালেদ তার মাকে ফোন করে বললেন, "মা তোমরা আমাকে শেষ করে দিলে। আমি এখন আর বাঁচবো না। তোমরা কেন এসব করতে গেলে?"

একথার দ্বারা তিনি হয়তো জনগণের মধ্যে মিছিলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকতে পারে মনে করে তিনি ঢাকার বাইরের তার বিশ্বস্ত অফিসারদের ইউনিটকে ঢাকা আসতে নির্দেশ দেন। যারা এলেন তারা সেনা-ছাউনির অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলেন।

৬ নভেম্বরের পরিস্থিতি

৬ নভেম্বর সকাল ৯টায় বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সা'দাত মুহাম্মদ সায়েম দেশের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জমজমাট বঙ্গভবন। সকল উর্ধ্বতন সিভিল ও মিলিটারি কর্মকর্তার ভিড়। হাসি-খুশি জেনারেল খালেদ মোশাররফ। আনন্দমুখর পরিবেশে প্রেসিডেন্ট সবার সাথে ঘুরে ঘুরে হাত মিলালেন। সর্বত্র সক্রিয় ক্যামেরা, টেলিভিশন।

ওদিকে সেনানিবাসে অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি হচ্ছে।

বিকেলে নতুন সেনাপ্রধান জেনারেলের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে হুটার বাজিয়ে কালো লিমোজিন গাড়িতে চড়ে বঙ্গভবন থেকে বাসায় এসে সন্ধ্যার পরই সেনানিবাস থেকে বের হয়ে যান সারাদিন তিনি মার্শাল ল'র আইন-কানুন ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজে চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হতে গোঁ ধরেন। আইয়ূব খাঁর উদাহরণ দেন যে, একই সাথে প্রেসিডেন্ট ও CMLA হওয়া যায়। সবাই অনেক অনুরোধ করে প্রেসিডেন্ট সা'দাতকে CMLA করে তাঁকে ডেপুটি হতে রাজি করা হলো।

রাত ১১টায় যখন খালেদ-শাফায়াত মার্শাল ল'র কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত, তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সকল ইউনিটের সৈনিকরা প্রস্তুত। আজ সবাই ভাই ভাই। চক্রান্তকারী অফিসারদের আজ রক্ষা নেই। ওদিকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে জাসদের বিপ্লবী বাহিনীর ইউনিফরম পরিহিত সশস্ত্র লোকজন ইবরাহিমপুর, বালুঘাট, রেলক্রসিং ও বনানী পয়েন্টে হুকুমের অপেক্ষায় প্রস্তুত। কর্নেল তাহের বীর-উত্তম তাদের নেতা, একটা সাদা জিপে তিনি সারা ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে রেডি করলেন। বাইরে

www.pathagar.com

তো বিপ্লবী গণবাহিনী পজিশন নিয়েই আছে। রাত বারোটার পর তাহেরের বিপ্লব শুরু হয়। ঐ রাতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী

১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টা থেকে ৭ তারিখ সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই এ রাতটিকে আমি 'বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী' নামে অভিহিত করছি।

বাংলাদেশের ভাগ্যে তিনটি সম্ভাবনা ছিলো ঃ

১. যদি খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হতেন তাহলে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সরকার কায়েম হতো এবং আওয়ামী লীগই এ সরকারের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতো।

২. যদি কর্নেল তাহেরের বিজয় হতো তাহলে দেশে জাসদের সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হতো। কর্নেল তাহের জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার পুরস্কারস্বরূপ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি আদায় করার উদ্দেশ্যে ঐ দাবিনামায় তার স্বাক্ষর করিয়ে নেন। জিয়া মুক্ত হবার পর যদি জাসদপন্থি অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হতেন তাহলে তাহেরের বিপ্লবী পরিকল্পনা সফল হয়ে যেতো। জেনারেল জিয়ার মুক্তির পরিবেশ কর্নেল তাহেরের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হলেও যারা জিয়াকে মুক্ত করে আনেন তারা জাসদপন্থি ছিলেন না। সে বিবরণ পরে আসবে। এটা আল্লাহরই খাস মেহেরবানী। তাহের ঐ রাতেই জেনারেল জিয়াকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে বক্তৃতা করিয়ে এবং ৭ তারিখ সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশে বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বন্দিমুক্ত জিয়াকে কর্নেল তাহের দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশ রুশ ভালুকের খপ্পর থেকে রেহাই পেয়ে গেলো।

৩. ভারতপন্থি ও রুশপন্থিদের বদলে বাংলাদেশপন্থি অফিসার ও সৈনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হওয়ায় এবং তাদের হেফাযতে থাকায় কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। জিয়া অত্যন্ত হুঁশিয়ারি ও বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে তাহেরের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রী হওয়া থেকে রক্ষা পেলো।

কর্নেল হামিদের লেখা তথ্য অনুযায়ী ৪ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের উপস্থিতিতে মুহাম্মদপুরে ও এলিফ্যান্ট রোডে কারো বাড়িতে জাসদ বিপ্লবী গ্রুপের গোপন বৈঠক হয়। তাহেরের নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করে আনবার মুষ্ঠিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় সবাই আবদ্ধ হয়। বন্দি হবার পূর্ব মুহূর্তে জিয়া বন্ধুবর তাহেরকে মেসেজ পাঠান, যাতে তাঁকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

"সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই" প্রচারপত্র ৫ তারিখ রাতেই প্রচুর বিলি হওয়ায় অফিসাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সপরিবারে ছদ্মবেশে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালাতে থাকেন।

www.pathagar.com

ক্যান্টনমেন্টের বাইরে-ভেতরে ৬ তারিখ দিবাগত রাতে যখন আঘাত হানার লগ্ন ঘনিয়ে আসছে, তখনো বঙ্গভবনে জেনারেল খালেদ মিটিং করছেন। তার সঙ্গে তখন কর্নেল শাফায়াত, কর্নেল মালেক, কর্নেল হুদা, মেজর হায়দার, জিল্লুর রহমান। রাত ১২টার পর বঙ্গভবনে খবর আসলো যে, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ানের সৈনিকরা অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেছে। একটি অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র লুট করেছে। কর্নেল মালেক বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ফোন করলে তার স্ত্রী বললেন, "সর্বনাশ! এখানে সৈনিকরা বিদ্রোহ করেছে। সাংঘাতিক ফায়ারিং চলছে।"

রাত ১২টা বিদ্রোহ শুরু

বিদ্রোহের সূচনা হলো রাত ১২টায় যখন সুবেদার মেজর আনিসুল হকের ইঙ্গিতে টু ফিল্ড রেজিমেন্টের লাইন থেকে একটি ট্রেইসার বুলেট আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে আকাশে উঠলো। এটাই ছিলো বিদ্রোহের সংকেত। সারা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ও বাইরে হাজার হাজার বুলেট ছুটে গেলো আকাশে। চারদিকে গোলাগুলি আর চিৎকার ধ্বনি।

কর্নেল হামিদ লিখেন, "ভয়ে ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার ছাদে উঠলাম। দেখলাম বহু লোক এক সাথে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার বাসার দিকে আসছে। দু'শ গজ দূরেই জিয়ার বাসা। একটা জীপ মাইক নিয়ে স্লোগান দিচ্ছে, "সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই।" দেখলাম উন্মাদ সৈনিকবৃন্দ জিয়ার বাসার দিকে ছুটে যাচ্ছে ও জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ স্লোগান দিচ্ছে। দেখা গেলো, জিয়ার বাসা থেকে একটা জীপ ঠেলে নিয়ে চিৎকার আর নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে আসছে। বুঝলাম জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমিও বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। সিভিল ড্রেসে আমার অফিসের দিকে হেঁটে চললাম। সিপাহীদের অস্ত্রহাতে লাফালাফি আর উল্লাস। জিয়ার বাসা ও টু-ফিল্ডের মাঝামাঝি প্রচণ্ড ভিড়।"

"সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই" স্লোগান শুনে কর্নেল চমকে উঠে বাসায় ফিরে গেলেন। হাবিলদার সিদ্দিকুর রহমান ফোন করে তাঁকে জানালেন, "স্যার কোথাও বেরুবেন না। আমরা এসে টু-ফিল্ডে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।" রাত ৩.৪০-এ হাবিলদার সিদ্দিক দু'জন সিপাহীসহ এসে তাঁকে নিয়ে গেলো, যেখানে জেনারেল জিয়া অফিসারদেরকে ডেকেছেন। প্রধান অস্ত্রাগার থেকে সৈনিকরা সকল অস্ত্র লুট করেছে। দেখা গেলো জিয়ার অবস্থান এলাকায় অস্ত্রধারী বহু সৈনিক। সিপাহীদের বিজয় মিছিল ও উল্লাস চলছে।

মুক্ত জিয়া

কর্নেল হামিদ টু-ফিল্ডে পৌঁছে দেখেন সশস্ত্র সৈনিক গিজগিজ করছে। কর্নেল আমিনুল হক বারান্দায় পায়চারি করছেন। দারুণ খুশি হয়ে কর্নেল হামিদকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে জিয়াকে বললেন, "স্যার স্টেশন কমান্ডারও এসে গেছেন।" দেখেই জিয়া উঠে ব্যাচমেটের সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করে বললেন, "হামিদ বসো, কেমন আছো?"

কর্নেল হামিদের ভাষায় পড়ুন ঃ

"মুক্তির পর তাকে অপূর্ব লাগছিলো। তাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তার মুখে চিরপরিচিত সেই মুচকি হাসি। যেন রীতিমতো নায়ক। ৭ নভেম্বরের সিপাহী-বিপ্লবের

www.pathagar.com

প্রকৃত নায়ক জিয়াই বটে। সশস্ত্র সৈনিকরা অফিসারদের বাসায় বাসায় গিয়ে জবরদস্তি করে ধরে এনে টু-ফিল্ডে জড়ো করেছে। বসা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার শওকত। সিপাহীরা যখন তাকে ভি.আই.পি গেস্ট হাউজে ধরে আনতে যায়, তখন তিনি প্রাণভয়ে পালাচ্ছিলেন, জিয়ার পাশে বসে তখন সর্বকর্নেল নূরুদ্দীন, আযহার, বারী, আবদুল্লাহ, কাশেম, হাবীবুর রাহমান।"

বন্দি জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো

খালেদ-শাফায়াত ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন গার্ড দিয়ে জিয়াকে তার বাসভবনেই আটক করে রাখেন। ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিলো। রাত বারোটায় তাহেরের বিপ্লবী সংস্থা ও অন্যান্য সিপাহীরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে বের হয়ে এসে জিয়ার বাসভবনের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। বাইরের বিপ্লবী সংস্থার নেতারা এসে বিভিন্ন ইউনিটের এন.সি.ও এবং জে.সি.ও-দের সাথে যোগাযোগ করে যায়। খালেদের প্লাটুন গার্ডকে হটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। জিয়াকে মুক্ত করার জন্য টু-ফিল্ডে রেজিমেন্ট আর্টিলারির একটি দল মেজর মহিউদ্দিন, মুস্তফা ও সুবেদার মেজর আনিসুল হক কতক সৈনিক নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। জিয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যত ইউনিটের লোকেরা প্রস্তুত হয়েছিলো তাদের কারো সাথে কোন অফিসার ছিলো না। রেজিমেন্ট আর্টিলারির দলটিতে অফিসার থাকায় তারা অতি সহজে সবার আগে জিয়ার বাসভবনে পৌছে। মেজর মহিউদ্দিন, সুবেদার মেজর আনিস টু-ফিল্ডের একদল সৈনিক নিয়ে যখন সেখানে পৌছেন তখন চারদিকে ব্যাপক ফায়ারিং চলছে। ফার্স্ট বেঙ্গলের যে প্লাটুনটি গার্ড দিচ্ছিলো, তারা অবস্থা বুঝে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেলো।

গেট খুলবার কেউ না থাকায় তারা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকলেন। জিয়ার ড্রাইভার বেরিয়ে আসে। জিয়া ও তার বেগম করিডোরে বের হন। "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই" স্লোগান দিয়ে বহু সৈনিক বাসায় ঢুকে পড়লো। জিয়া পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তাই মেজর মহিউদ্দিন যখন জিয়াকে বললেন, "স্যার আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি আসুন," তখন জিয়া বললেন, "আমি রিটায়ার করেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই। আমি কোথাও যাবো না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মেজর মহিউদ্দিন দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমরা আপনাকে নিয়েই যাবো। আপনাকে আবার আমরা চিফ বানাতে চাই। দোহাই আল্লাহর। আপনি আসুন।" বেগম জিয়া পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন গোলাগুলির মধ্যে স্বামীকে নিতে চাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "দেখুন ভাই, আমরা রিটায়ার করেছি। আমাদের নিয়ে টানাটানি করবেন না। দয়া করে আমাদেরকে ছেড়ে দিন।"

বেগম জিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। ততক্ষণে আরো বহু সৈনিক জড়ো হয়ে গেছে। জিয়াকে মুক্ত দেখে আনন্দের সীমা নেই। চতুর্দিকে স্লোগান, "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ!" তাহেরের বিপ্লবীরা পৌছার আগেই আর্টিলারির সৈনিকরা বিপুলভাবে জিয়াকে ঘেরাও করে নিয়ে গেলো।

www.pathagar.com

তাহেরের ক্ষমতা দখল-প্রচেষ্টা

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লব ব্যর্থ করা ও বন্দিদশা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করার ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু জিয়া মুক্ত হওয়ার পর ঐ রাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে কর্নেল তাহেরের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিলো না। তাহের ও জিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক মহলও তেমন কিছু জানতো বলে মনে হয় না। কর্নেল হামিদ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে নাটকীয় চিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এর কোন সামান্য আভাসও মিজানুর রাহমান চৌধুরী, এডভোকেট সা'দ আহমদ ও মেজর ডালিমের বইতে পাওয়া যায়নি।

আমি তাহের ও জিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই-এর ঘটনাটিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করি। ইতিহাস সচেতন সবারই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই এ ঘটনার বিবরণ কর্নেল হামিদের পুস্তক থেকে তারই ভাষায় পরিবেশন করছি ঃ

মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াই

৬/৭ নভেম্বরের মধ্যরাতে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকবৃন্দের যৌথ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জিয়াউর রহমান গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় চিফ অব স্টাফের গদিতে সমাসীন হন।

এবার শুরু হলো প্রকৃত ক্ষমতার লড়াই। মূল অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন কর্নেল তাহের। তার সাথে জিয়াউর রহমানের কী সমঝোতা হয়েছিলো, তা শুধু তারা দু'জনই জানেন। জিয়াকে মুক্ত করার কিছুক্ষণ পরই তাহের টু-ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার কাছে ছুটে আসেন। তখন রাত প্রায় ২-৩০ মিনিট। ঐ সময় জিয়ার কক্ষে গুটিকয় অফিসার; কর্নেল আমিনুল হক, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর জুবায়ের সিদ্দিক, মেজর মুনির, সুবেদার মেজর আনিস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জিয়া ও তাহের উভয়ে একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। জিয়া বললেন, 'তাহের তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে বাঁচিয়েছো।'

তাহের বললো, 'আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে। এদিকে আসুন প্লিজ, তাহের তাকে নিয়ে কক্ষের একটি নিভৃত কোণে গেলো। বহুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে গোপন কথাবার্তা চলতে থাকলো। একসময় তাদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলো। এক ফাঁকে জিয়া বারান্দায় এসে সুবেদার মেজর আনিসকে কানে কানে বললেন, 'আনিস সাহেব, ওকে কোনভাবে সরিয়ে দিন এখান থেকে। সাবধান, বহু পলিটিকস্ আছে।'

তাহের জিয়াকে টু-ফিল্ড থেকে বের করে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চাইছিলো।

রেডিও স্টেশনে তার লোকজন উপস্থিত ছিলো। ওটাকে তারা শক্ত ঘাঁটি করেছিলো। তাহের বললো, 'আসুন, জাতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

জিয়া যেতে চাচ্ছিলেন না সঙ্গত কারণেই। এতে তাহের খুবই রেগে যায়। উপস্থিত কর্নেল আমিন, মুনীর ও সুবেদার মেজর আনিস তারা জিয়ার পাশে থেকে বলেন,

www.pathagar.com

রেডিওতে ভাষণ দিতে হলে এখানেই রেকর্ডিং যন্ত্র আনা হবে। তাকে এখান থেকে বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। ভেস্তে যায় তাহেরের প্ল্যান।

সুবেদার মেজর আনিস কর্নেল তাহেরকে বললেন, 'আপনি এখন দয়া করে আসুন।' তাহের কটমট করে তার দিকে তাকালো। বললো, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

আনিস বললো, জ্বি স্যার, আপনাকে চিনি। তবে এখন আমার সাথে আসুন। তাহের বুঝে ফেললো, জিয়াউর রহমান কিছুতেই এই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে তার সাথে বাইরে যাবে না। অগত্যা তাহের তার ভাই ইউসুফ এবং অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাগে বিড়বিড় করতে করতে অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে টু-ফিল্ড লাইন ত্যাগ করল। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে তখন চলছে সৈনিকদের আনন্দ উল্লাস।

ক্ষমতার সিংহাসনে বসার সন্ধিক্ষণে দুই বাদশাহ। এক সিংহাসন। মধ্যরাতের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নাটক জমে উঠলো। কে কাকে উৎখাত করে! একজনকে মরতে হবেই।

জিয়া তখন টু-ফিল্ডে কমান্ডিং অফিসারের বড় কামরায় অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে বেশ কিছু অনুগত জেসিও সৈনিকও তার পাশে। আসলে তখনও উপস্থিত অফিসাররা কেউ বুঝে উঠতে পারছিলো না, বাইরের অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসার কর্নেল তাহেরকে জিয়া কেন মুক্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার সাথে বিপ্লবের কিইবা সম্পর্ক? কেন তাহের এতো রাগান্বিত, উত্তেজিত? তার সাথে এতোক্ষণ একান্তে কিইবা আলাপ হলো? তার সাথে কি জিয়ার কোন গোপন সমঝোতা রয়েছে? সবার কাছেই ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক ঠেকলো। কিন্তু মুক্তির আনন্দঘন মুহূর্তে কেউ এসব তলিয়ে দেখার চিন্তা করেনি।

সাধারণ সৈনিকদের ধারণা ছিলো, জিয়াকে মুক্ত করার পরই সিপাহী-বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে। তারা ব্যারাকে ফিরে যাবে, কিন্তু বাইরের বিপ্লবী সৈনিক ও বিপ্লবী নেতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন, অনেক গভীর। টু-ফিল্ডে কর্নেল তাহেরের আগমন এবং জিয়ার সাথে রাত আড়াইটায় উত্তপ্ত কথোপকথনের পরই রহস্য ঘনীভূত হতে শুরু করলো। এবার উন্মোচিত হতে শুরু করলো, বিপ্লবী নেতা কর্নেল তাহেরের দ্বিতীয় পর্বের খেলা।

টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের অফিসে বসে আছেন সদ্যমুক্ত জিয়া। তাকে ঘিরে বসে আছেন বাসা থেকে ধরে আনা অফিসারবৃন্দ। অফিসের বাইরে ভেতরে গিজ গিজ করছে ঢাকা সেনানিবাসের হাজার সৈনিক। ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিক থেকে যে বলয় সৃষ্টি করে সৈনিকরা জিয়ার বাসভবনের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছিলো, তা এখন টার্গেট-পয়েন্টে এসে স্তিমিত হয়ে গেছে। সর্বত্র আনন্দ উল্লাস। তারা মাঝে মাঝে ছুঁড়তে থাকে ফাঁকা গুলী।

সমস্ত প্ল্যান-প্রোগামই ছিলো সাধারণ সৈনিকদের এবং বিপ্লবী তাহের গ্রুপের। শত শত সৈনিকদের পদভারে টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন প্রকম্পিত। এদের মধ্যে বহু সৈনিক দেখা গেলো এলোমেলো খাকি ড্রেস। পায়ে ছিলো বুটের বদলে সাধারণ জুতা। অনেকের মাথায় টুপিও নাই। এরাই ছিলো জাসদের বিপ্লবী সংস্থার সশস্ত্র সদস্যবৃন্দ। সিপাহী-বিদ্রোহের রাতে খাকি উর্দি পরে তারা মিশে গিয়েছিলো ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ জওয়ানদের সাথে। উপস্থিত শত শত সৈনিকের মধ্যে কে বিপ্লবী সৈনিক, কে আসল সৈনিক, বুঝা মুশকিল হয়ে পড়েছিলো। তারাই অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান

www.pathagar.com

দিচ্ছিলো। রাতের বেলা আমিও তাদের দেখে চিনতে পারিনি। সকালবেলায়ও বিপ্লবীদের উপস্থিতি বুঝতে পারিনি। দুপুরবেলা টের পেলাম।

সবার অলক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্টে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বন্ধু ক্ষমতার আঙুর ফল নিয়ে করছে কাড়াকাড়ি। জিয়া দ্রুত তার সেনা ইউনিট ও অফিসারদের নিয়ে তাহেরের প্রাথমিক হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন। টু-ফিল্ডে বসেই তিনি বেতার ভাষণ দিলেন। টু-ফিল্ডের অফিসেই রেডিও রেকর্ডিং ইউনিট এনে জিয়ার একটি ভাষণ রেকর্ড করা হলো ভোর বেলা প্রচার করার জন্য।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে জিয়া ঘোষণা করেন, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর অনুরোধে তিনি এই কাজ করেছেন। তিনি সবাইকে এই মুহূর্তে শান্ত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিস-আদালত, বিমানবন্দর, মিল-কারখানা পুনরায় চালু করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ আমাদের সহায়।

জিয়ার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সবাইকে আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত করে তুললো।

মধ্যরাতের লড়াইয়ে হেরে গেলেন তাহের। জয়ী হলেন জিয়া। ক্ষণিকের জন্য তাহেরের পশ্চাদপসরণ। সকালবেলা নতুন শক্তি সঞ্চয়ের আশায়।

জাসদের উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যদিও কর্নেল তাহেরের লক্ষ্য ছিলো অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। তাহের সৈনিকদের ১২ দফা দাবি প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে ছিলো; ব্যাটম্যান প্রথার বিলুপ্তি, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর, সৈনিকদের মধ্য থেকে অফিসার নিয়োগ, সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থান ব্যবস্থাকরণ, দুর্নীতিবাজ অফিসারদের অপসারণ, রাজবন্দিদের মুক্তি। বিপ্লবী সৈনিকদের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো বিপ্লবের মাধ্যমে ১২ দফা বাস্তবায়ন। তাহেরের মতে, জিয়ার সাথে তার আগেই এসব নিয়ে সমঝোতা হয়েছিলো। তাহের ভেবেছিলো সে-ই অধিক বুদ্ধিমান। জিয়াকে ব্যবহার করে সে ক্ষমতায় আরোহণ করবে! কিন্তু তার সেই ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছিলো।" (পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৬)

সিপাহী-জনতার বিপ্লব

মধ্যরাতে জিয়াউর রহমানকে কিছুটা কমান্ডো স্টাইলে বিনাবাধায় মুক্ত করার পর সকালবেলা বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত সৈনিক তাদের ইউনিটের ট্রাকে চেপে স্লোগান দিতে দিতে শহরের দিকে ছুটতে থাকে। তাদের হুকুম দেওয়ার, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। নতুন স্লোগান উঠলো 'সিপাহী-জনতা-ভাই ভাই।' অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার! রাস্তায় রাস্তায় স্লোগানমুখর জনতা বেরিয়ে আসে সৈনিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে।

দেখতে দেখতে সিপাহী-বিপ্লব মোড় নেয় ঐতিহাসিক 'সিপাহী-জনতার' বিপ্লবে। শহরে রাস্তায় মানুষের ঢল। সিপাহী-জনতা-ভাই ভাই।

ভোরবেলা বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো প্রবল বেগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। সারা রাত তারা শান্তভাবে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর কোণে বসে বসে ঘটনা পরখ করছিলো। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ারের ডাকে ভোর পাঁচটার দিকে তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের

www.pathagar.com

হয়ে শহরের দিকে ধেয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ট্যাংক। জনতা প্রবল উল্লাসে ট্যাংকগুলো ঘিরে ধরে সিপাহীদের সাথে মিশে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে। সিপাহী-জনতার উল্লাস ব্যাপক উন্মাদনায় রূপ নেয়। সর্বত্র এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। "সিপাহী-জনতা-ভাই ভাই। সিপাহী-বিপ্লব জিন্দাবাদ।"

খালেদ আসলেন

সকাল ৭ ঘটিকা। টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের ব্যস্ততা, দ্রুত আনাগোনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারা হেলেদুলে ঘুরছে ফিরছে আপন খেয়ালে। অন্যসময় হলে অফিসারদের পাশ দিয়ে যেতে তাদের স্মার্ট স্যালুট দিয়ে চলতে হতো। আজ এসব বালাই নেই। আজ তাদের রাজ্যে তারাই রাজা।

এমন সময় সৈনিকদের ভিড় ঠেলে একটি আর্মি ট্রাক শোঁ শোঁ বেগে এগিয়ে এলো। ভেতর থেকে নেমে এলো একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। স্যালুট দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, জেনারেল জিয়া কোথায়?" জরুরি ব্যাপার আছে। বললাম, "কি ব্যাপার আমাকেই বলো।"

সে বললো, "স্যার, খুবই জরুরি, উনাকে বলতে হবে। আমাকে উনার কাছে নিয়ে চলুন প্লিজ।" ঐদিন প্রটোকলের কোন বালাই ছিলো না। বললাম, "আসো আমার সাথে।"

আমি তাকে নিয়ে জিয়ার কামরায় ঢুকলাম, "তাকে বললাম, এই ছেলেটি তোমাকে কিছু বলতে চায়।" লেফটেন্যান্ট তৎক্ষণাৎ জিয়াকে একটি স্মার্ট স্যালুট দিয়ে বললো, "Sir, I have come to present you dead body of Khaled Musharraf, Col. Huda and Hyder, Sir" জিয়া অবাক! ব্রিগেডিয়ার খালেদের ডেড্‌বডি। আমার দিকে তাকিয়ে জিয়া বললেন, "দেখতো হামিদ, কি ব্যাপার!" আমি অফিসারকে সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো কালো ট্রাকের পেছনে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখি ট্রাকের পাটাতনে খড় চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি মৃতদেহ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার। খালেদের পেটের ভুঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিলো। তাকে পেটের মধ্যে গুলী করা হয়েছিলো, হয়তো বা বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিলো। কি করুণ মৃত্যু! আমি জিয়াকে কামরায় গিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, খালেদ, হুদা আর হায়দারের ডেডবডি।" সে জিজ্ঞাসা করলো, "এগুলো এখন কি করা যায়?" আমি বললাম, "আপাততঃ এগুলো CMH-এর মর্গে পাঠিয়ে দেই।" জিয়া বললো, "প্লিজ হামিদ, এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।"

হায় খালেদ মোশাররফ! তিনি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলেন বটে। তবে জীবিত নয়, ফিরে এলো তার প্রাণহীন দেহ।" (পৃষ্ঠা : ১৩৫)

৩ থেকে ৬ নভেম্বর দেশবাসী অন্ধকারে

৩ নভেম্বর থেকে রেডিও-টেলিভিশন বন্ধ থাকায় রাজধানীর রাজনৈতিক সচেতন সবাই চরম উদ্বিগ্ন অবস্থায় ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট ও বঙ্গভবনে কী ঘটছে তা জানতে না পারায় অস্থিরতা বেড়েই চলছিলো। গোটা দেশবাসী একেবারেই অন্ধকারে ছিলো। এ রকম অবস্থায় গুজবের মাধ্যমেই মানুষ উড়ো খবর পেতে থাকে। গোটা দেশই স্থবির হয়ে রইলো। দেশে কোন সরকার আছে কিনা বুঝা যাচ্ছিলো না। অফিস আদালতেও তেমন কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

৪ তারিখ বিকেলে আওয়ামী লীগের মিছিল রাজধানীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আগস্ট-বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাকশালীরা আবার জেগে উঠেছে। নিশ্চয় ভারতের সাহায্যে প্রতি-বিপ্লব ঘটেছে। ঐ মিছিলের জয় বাংলা স্লোগান ও শেখ মুজিবের ৩২ নং বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করলো। আগস্ট-বিপ্লবের নেতারা ৩ তারিখ রাতে বিদেশে নির্বাসনে চলে যাওয়ায় জনগণকে সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ দেখা গেলো না। প্রেসিডেন্ট মুশতাকের পক্ষে কোন সাংগঠনিক শক্তি ময়দানে ছিলো বলে বুঝা গেলো না। কিন্তু সর্ব-সাধারণ আগস্ট-বিপ্লবের পক্ষে থাকায় রাজধানীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকের মধ্যে ছিলো বলে ৫ তারিখে টের পাওয়া গেলো।

ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা মাইকে প্রচার করতে লাগলো যে, ভারত বাংলাদেশ দখল করার চেষ্টা করছে। ভারতের দলখদারদের থেকে সাবধান! তাদের সহযোগী খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে। খালেদ মোশাররফকে ভারতের দালাল বলে সৈনিকদের মধ্যে প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। সৈনিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে, আমরা কি আর মুসলমান হিসেবে ধর্ম-কর্ম করতে পারবো না?

ঢাকায় জাগ্রত জনতার প্রচারপত্র

৫ তারিখ সকালে ছোট একটি প্রচারপত্র রাজধানীর জনগণের মুখে ভাষা তুলে দিলো। এর শিরোনাম ছিলো, "ভারতের পা-চাটা কুকুর খালেদ মোশাররফ নিপাত যাক।" প্রচারকের নাম দেওয়া হয় জাগ্রত জনতা। অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় জর্জরিত ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে এ প্রচারপত্রটি অদ্ভুত প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। তাদের মনের কথা যেন ভাষা পেলো। এক একটি প্রচারপত্র শত শত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যার হাতে পড়েছে সে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। কোথাও বিলি হচ্ছে দেখলে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে অন্যদেরকে দেখাচ্ছে। সামান্য সাংগঠনিক প্রচেষ্টার অপেক্ষায় যেন ময়দান প্রস্তুত হয়েই ছিলো। সামান্য একটি প্রচারপত্র গোটা রাজধানীতে এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো।

জেল হত্যার খবরে জনগণের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। মুজিব হত্যায় যেমন জনগণ উল্লাস প্রকাশ করেছে, জেল হত্যায় তেমন না হলেও জনগণ এটাকে আগস্ট-বিপ্লবের পক্ষে বলেই ধারণা করেছে। ঐ সময় বিরূপ পরিবেশের কারণে জেল হত্যার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ মিছিলও বের হয়নি।

উপরিউল্লিখিত ছোট হ্যান্ডবিলটি দ্বারা যে কাজ হয়েছে এতে প্রমাণিত হয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও জনগণের মনোভাব বুঝে যদি অল্প কিছু লোকও সুসংগঠিতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে জনমত গঠনের চেষ্টা করে তাহলে সামান্য প্রচেষ্টায়ও বিরাট সুফল পাওয়া যায়। এ কাজটি কারা করেছে তা জানার জন্য আমি ঐ সময় ইসলামী আন্দোলনের ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকজন দায়িত্বশীলের সাথে আলোচনা করেছি।

ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ

আমি ১৯৭৫ সালে লন্ডন থাকাকালে জানতাম যে, ইসলামী ছাত্রকর্মীরা ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার সংহতি মিছিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই '৭৫ সালে

www.pathagar.com

ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহেরের সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন বোধ করলাম।

পাকিস্তান আমলে ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনের নাম ছিলো, 'ইসলামী ছাত্রসংঘ'। শেখ মুজিবের শাসনামলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইসলামী সংগঠন বেআইনী ছিলো। তাই প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠন হিসেবে তৎপরতার কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু ইসলামী সংগঠন করা ফরয বলে অপ্রকাশ্যেই দীনের দাওয়াত পৌঁছানো ও সংগঠিতভাবে যতটুকু তৎপরতা সম্ভব তা করা হচ্ছিলো। ১৯৭৫ সালে অপ্রকাশ্য ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির নিকট থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তার ভিত্তিতেই ৭ নভেম্বরের বিবরণ দিচ্ছি।

১৯৭২ সালের অক্টোবরেই এ ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হবে। অপ্রকাশ্য জামায়াতে ইসলামীও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই এ দুটো সংগঠনই তথাকথিত 'মুসলিম বাংলা' নামে আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। এ আন্দোলনের নেপথ্যে যারাই থাকুক, ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জামায়াতে ইসলামী এ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়নি।

১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামী সংগঠনবিরোধী ধারা বাতিল হয়ে যাবার পর ইসলামী ছাত্র সংগঠনটি 'ইসলামী ছাত্র শিবির' নাম ধারণ করে প্রকাশ্য তৎপরতা চালায়।

১৯৭৫ সালে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহের ও মীর কাসেম আলী। আমি সভাপতি থেকে জানতে পারলাম, কেন্দ্রীয় শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই তারা ৫ নভেম্বরের পূর্বোক্ত প্রচারপত্র বিলি করে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এরপর কী ঘটছে সে বিষয়ে বিস্তারিত খবর না জানলেও জনগণের ময়দানে ভারতপন্থিদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৫ নভেম্বর বিলিকৃত হ্যান্ডবিলের ইতিবাচক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা প্রকাশ্যে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আরও একটি প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করে।

৭ নভেম্বর সকালে তাদের ক্ষুদ্র জনশক্তি নিয়ে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে রাজপথে বের হয়। প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিলো, "ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।" প্রচারপত্রটি ছাত্রসংঘের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক নাযির আহমদ ড্রাফট করেন বলে নিজামী সাহেব ও আবু নাসের থেকে জানা গেলো। এ হ্যান্ডবিলটির বক্তব্য পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে খবর হিসেবে প্রকাশিত হয় বলে আবু নাসের জানালেন।

জানা গেলো যে, এ প্রচারপত্রটি ইসলামী ছাত্রসংঘের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক নাযির আহমদ (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর) ড্রাফট করেছিলেন। ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার সংহতি মিছিলে যারা বক্তব্য রেখেছে তারা ঐ প্রচারপত্রে বক্তৃতার প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, ভারতের আধিপত্য প্রতিরোধ করা ও গণতন্ত্র বহাল করার উদ্দেশ্যে যে আগস্ট-বিপ্লব সাধিত হয় এরই

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতায় ৭ নভেম্বরের সিপাহী-বিপ্লব ঘটে। জনগণ এ উভয় বিপ্লবেরই পক্ষে বলে প্রচারপত্রে ঘোষণা করা হয়।

খালেদ কিভাবে নিহত হলেন

ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিনা রক্তপাতে সামরিক বিপ্লব সাধন করলেন। জেনারেলের মর্যাদা নিয়ে সেনাপ্রধান হলেন। বঙ্গভবনও দখল করলেন। তিন দিনের মধ্যেই তিনি কীভাবে নিহত হলেন? সেনাপ্রধান হিসেবে কি তার দেহরক্ষীবাহিনী ছিলো না? তার সমর্থক বাহিনী ও বিরোধীদের মধ্যে কি কোন সশস্ত্র লড়াই হয়েছিলো? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জওয়াব তালাশ করে পাচ্ছিলাম না। কর্নেল হামিদের বই থেকে এ সবের বিস্তারিত জওয়াব পেলাম ঃ

"৬ তারিখ রাত ১২ টায় সিপাহী-বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাইভেট কার নিয়ে বঙ্গভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। তার সাথে ছিলো কর্নেল হুদা ও হায়দার। তারা দু'জন ঐদিনই ঢাকার বাইরে থেকে এসে খালেদের সাথে যোগ দেন।

খালেদ প্রথমে রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় যান। সেখানে তার সাথে পরামর্শ করেন। নুরুজ্জামান তাকে খাকি ড্রেস পাল্টিয়ে নিতে অনুরোধ করে। সে তার নিজের একটি প্যান্ট ও বুশ সার্ট খালেদকে পরতে দেয়। ৪র্থ বেঙ্গলে সর্বশেষ ফোন করলে ডিউটি অফিসার লে. কামরুল ফোন ধরে। সে তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। এবার খালেদ বুঝতে পারেন অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। ১০ম বেঙ্গলকে বগুড়া থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন তার নিরাপত্তার জন্য।

প্রথমে নিরাপদেই তারা বিশ্বস্ত ইউনিটে আশ্রয় নেন। তখনো ওখানে বিপ্লবের কোন খবর হয়নি। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ। তাকে দেওয়া হয় খালেদের আগমনের সংবাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে টু-ফিল্ডে সদ্যমুক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তার ইউনিটে খালেদ মোশাররাফের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন। তখন ভোর প্রায় চারটা। জিয়ার সাথে ফোনে তার কিছু আলাপ হয়। এরপর তিনি মেজর জলিলকে ফোন দিতে বলেন। জিয়ার সাথে মেজর জলিলের কিছু কথা হয়। তাদের মধ্যে কি কথা হয়, সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে কর্নেল আমিনুল হক বলেছেন, তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জিয়াকে বলতে শুনেছেন, যেন খালেদকে প্রাণে মারা না হয়। ঐ সময় রুমে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তবে টেলিফোনে কার সাথে তার কথাবার্তা হচ্ছিলো, তা অনুধাবন করতে পারিনি।

যা হোক, ভোরবেলা দেখতে দেখতে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রবল ঢেউ ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে লাগতে শুরু করে। সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। পরিস্থিতি কর্নেল নওয়াজিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারা খালেদ ও তার সহযোগীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সিপাহীরা তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে। ইউনিটের অফিসার মেজর আসাদের বিবৃতি অনুসারে কর্নেল হুদা হায়দারকে তার চোখের সামনেই মেস থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে প্রকাশ্যে সৈনিকরা গুলি করে হত্যা করে। বাকি দু'জন উপরে ছিলেন তাদের কিভাবে মারা হয় তা সে দেখতে পায়নি। তবে জানা যায় হায়দার, খালেদ ও হুদা

www.pathagar.com

অফিসার মেসে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন। কর্নেল হুদা ভীত হয়ে পড়লেও খালেদ ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত। হুদাকে তিনি অস্থির হতে মানা করলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন।

জানা গেছে, মেজর জলিল কয়েকজন উত্তেজিত সৈনিক নিয়ে মেসের ভেতরে প্রবেশ করে। তার সাথে একজন বিপ্লবী হাবিলদারও ছিলো। সে চিৎকার দিয়ে জেনারেল খালেদকে বললো, "আমরা তোমার বিচার চাই!" খালেদ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আমার বিচার করো। আমাকে জিয়ার কাছে নিয়ে চলো।"

স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বাগিয়ে হাবিলদার চিৎকার করে বললো, "আমরা এখানেই তোমার বিচার করবো।"

খালেদ ধীরস্থির, বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা আমার বিচার করো।" খালেদ দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলেন।

ট্যা-র-র-র-র! একটি ব্রাশ ফায়ার! আগুনের ঝলক বেরিয়ে এলো বন্দুকের নল থেকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ। সাঙ্গ হলো বিচার। শেষ হলো তার বর্ণাঢ্য জীবনেতিহাস।" (পৃষ্ঠা : ১৩৬ ও ১৩৭)

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সেনাপ্রধানের পদ জোর করে দখল করার পর খালেদ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে রইলেন যে, তিন দিন থেকে ক্যান্টনমেন্টে গড়ে উঠা সেনা-বিদ্রোহের খবর তাঁকে দেবার মতো একজন বিশ্বস্ত অফিসারও তার পক্ষে ছিলেন না। শেষ মুহূর্তে ৬ তারিখ দিবাগত দুপুর রাতে খবর পেয়ে তাঁকে বঙ্গভবন থেকে পালাতে হলো। তার হেফাজতের জন্য বঙ্গভবনেও সামরিক গার্ডের ব্যবস্থা ছিলো না। খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের যে পর্যালোচনা কর্নেল হামিদ লিখেছেন তা হুবহু পেশ করছি ঃ

"খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের-একটি পর্যালোচনা

মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়েছিলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের রক্তপাতহীন ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান। আর্মির দু'জন সিনিয়র অফিসারের পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়েছিলো এই অভ্যুত্থান, কিন্তু ব্যর্থ হলো শোচনীয়ভাবে। নিহত হলেন অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ। খালেদ ছিলেন একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কিন্তু নভেম্বর 'ক্যু' সামাল দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বেসামাল হয়ে পড়েন। এর আগে তিনি কখনো এমন অদক্ষতার পরিচয় দেননি।

৩ নভেম্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, ওটার প্রস্তুতি হয়েছিলো ঘটা করে প্রায় সবাইকে জানিয়েই। কিন্তু এসেছিলো অতি নীরবে, নিঃশব্দে, মধ্যরাতে। একটি বুলেটও ফায়ার হয়নি, একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠে জানতে পারে, আর্মির ক্ষমতা বদল হয়েছে। জিয়া আর চিফ অব স্টাফ নেই। তিনি বন্দি। খালেদ মোশাররফ নতুন অধিনায়ক।

কেন ব্যর্থ হলো অভ্যুত্থান?

১. রাজনৈতিকভাবে সময়টা ছিলো অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। বিভিন্ন কারণে ঐ সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। খালেদের

www.pathagar.com

অভ্যুত্থানকে ভারতপন্থি এবং বাকশালপন্থি মনে করে সবাই ভীত হয়ে পড়ে। সৈনিকদেরও তাই ধারণা হয়। ঐ সময় এ রকম অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা খালেদ মোটেই পর্যালোচনা করে দেখেননি।

২. আর্মি চিফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ধরে রাখাটা ছিলো একটি ভুল সিদ্ধান্ত। এতে বন্দি জিয়ার সপক্ষে সিপাহী থেকে নিয়ে সকল স্তরের লোকজনদের সহানুভূতি জেগে ওঠে, যা খালেদের বিপক্ষে চলে যায়। বন্দি জিয়ার ইমেজ, মুক্ত জিয়া থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত 'Counter' অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জিয়ার মুক্তি। খালেদ মোশাররফ তার ভ্রান্ত স্ট্রাটেজির দ্বারা তার অজান্তেই প্রতিপক্ষ জিয়াউর রহমানকে 'হিরো' বানিয়ে দেন।

৩.. ৪ তারিখ আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ছোট ভাই নেতৃত্ব দেওয়ায় সবার কাছে খালেদ আওয়ামী লীগপন্থি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এটা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে চলে যায়।

৪. অধিকাংশ সৈনিক ধার্মিক ও নামাযী। তারা বহুদিন পর আল্লাহু আকবার, বিস্‌মিল্লাহ, জিন্দাবাদ ইত্যাদি শ্লোগান শুনে মুশতাকের পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারা খালেদের প্রত্যাবর্তনকে ধর্মের বিপক্ষে মনে করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

৫. খালেদ-শাফায়াত শুধু বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর নির্ভর করে অভ্যুত্থান করেন। প্রধানত এটা ছিলো ৪৬ ব্রিগেডের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যু। এতে স্বভাবতই ঢাকা 'লগ এরিয়া' ইউনিটগুলো, যথা– সিগন্যালস, সাপ্লাই, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, ইঞ্জিনিয়ার্স, এ্যাক এ্যাক, বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাঙ্ক) টু-ফিল্ড আর্টিলারি এসব ইউনিট ক্ষেপে যায়। তারা একত্রে মিলে পদাতিক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৬. খালেদের ক্যু'তে মোটেই পাবলিক সাপোর্ট বা জনসমর্থন ছিলো না। এমনকি পূর্ণ সৈনিক সমর্থনও ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি কোন পাত্তাই দেননি। কেবল দুজন সিনিয়র ও কিছু তরুণ অফিসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সেন্টিমেন্টের উপর নির্ভর করে অভ্যুত্থান হয়। তাই এর ভিত্তি ছিলো খুবই নাজুক।

৭. জিয়াকে বন্দি করায় সাধারণ সৈনিকবৃন্দ অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে খালেদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলে সিপাহীদের জড়ানো কেউ ভালো চোখে দেখেনি। মূলত সৈনিকদের এই সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করেই জাসদের 'খালেদ বিরোধী' প্রোপাগাণ্ডা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। আর্মির চিফ অব স্টাফকে বন্দি করে তার অধীনস্থ ডেপুটির জোর করে সেনাপ্রধান হওয়াকে সৈনিকদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

৮. খালেদের 'ক্যু' ছিলো নরম ও মানবিক। প্রধান প্রতিপক্ষ নায়ক জিয়াউর রহমানকে জীবিত রেখেই তিনি ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব বড়ই রূঢ়। এখানে চরম নির্দয়তাই সাধারণত সফলতার প্রধান চাবিকাঠি। খালেদ সে পথে যায়নি, ফলে প্রধান নায়ক জিয়াউর রহমান জীবিত থাকায় অতি দ্রুত তাকে কেন্দ্র করে প্রতি-বিপ্লব সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

৯. নভেম্বর অভ্যুত্থান ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ মেজরদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যুত্থান। তাদের দ্বারা সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা অতি সহজ কাজ হলেও পরবর্তী ধকল সামলানো সহজ ব্যাপার ছিলো না। খালেদ যখন মধ্য পর্যায় থেকে অপারেশন পরিচালনা শুরু করেন, তখন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। বঙ্গভবনে প্রতিপক্ষ গ্রুপ ততক্ষণে শক্ত 'অপজিশন' নিয়ে ফেলেছে।

১০. খালেদের অপারেশনে 'গোপনীয়তা' বলে কিছু ছিলো না। সবাই জেনে যায়। এতে জিয়ার পক্ষে আগাম counter অ্যাকশন পরিকল্পনা করা সহজ হয়। এছাড়াও তাদের প্ল্যানে কোন গতি, আক্রমণ, আঘাত হানা, ধ্বংস, ক্যাপচার কিছুই ছিলো না। এটা নিছক আলোচনা আর আপসরফার অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। দেখেশুনে মনে হয়েছে, এটা যেন বাবুদের একটি Telephone Battle. খালেদ আলোচনা ও ডিপ্লোমেসিতে অযথা সময় নষ্ট করেন। তিনি ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা সংহত করতে বহু সময় অপচয় করেন, যা তার ধ্বংস ডেকে আনে। ক্যান্টনমেন্টে যখন বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে, তখনো তিনি বঙ্গভবনে তার প্রমোশন ও রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তার মতো একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের এরকম হেঁয়ালিপনা সবাইকে অবাক করে।

১১. রেডিও, টিভি, সবকিছু বন্ধ রেখে তিনি তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে জাতিকে ও সশস্ত্র বাহিনীকে কিছুই জানতে দেননি। তিনি যে ক্ষমতায় আছেন, এর সামান্য উত্তাপও কেউ টের পায়নি। জনগণ ও সৈনিকদের প্রভাবিত করার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। এ কয়দিন তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন সৈনিক ও জনগণ থেকে। গণ-মিডিয়া বন্ধ থাকায় সর্বত্র সৃষ্টি হয় নানা গুজব ও বিভ্রান্তি, যা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে কাজ করে।

১২. বঙ্গভবনে তিনি যখন বেহুদা আলোচনায় রত, তখনই ক্যান্টনমেন্টে তার বিরুদ্ধে সেনা-বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তিনি ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ বে-খবর। ফলে কোন counter ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সৈনিকরাও যে সংগঠিত হয়ে কমান্ডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহ করতে পারে, এ রকম ধ্যান-ধারণা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মাথায় আসেনি।

১৩. তার কমান্ডে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ট্রুপস এক-চতুর্থাংশও তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। তরুণ অফিসারদের উপরই তিনি বেশি নির্ভরশীল ছিলেন।

১৪. খালেদ-শাফায়াত সম্পর্ক ভালো থাকলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (AIM) অভিন্ন ছিলো না। শাফায়াত জামিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, মেজরদের বঙ্গভবন থেকে বহিষ্কার এবং 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠা ও নিজেই ক্ষমতা সুসংহত করা। কিন্তু খালেদ মোশাররফের প্রধান লক্ষ্য ছিলো, ক্ষমতা দখল এবং জিয়াকে সরিয়ে নিজে চিফ অব স্টাফ হওয়া। দুই প্রধান ক্যু-নেতার লক্ষ্যের অভিন্নতা না থাকায় খালেদ শুরু থেকেই ইচ্ছা থাকলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে সরাসরি আরোহণ করতে পারেননি। এছাড়া নেপথ্যে জিয়ার সাথে ছিলো শাফায়াত জামিলের মধুর সম্পর্ক।

www.pathagar.com

প্রাথমিক অবস্থায় সে জিয়াকে 'চিফ' রেখেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলো। এখন ঐ কাজটিই খালেদ মোশাররফকে নিয়ে করতে হচ্ছিলো।

১৫. ফারুক-রশীদের দৃঢ় অভিমত, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক জিয়াউর রহমান; খালেদ মোশাররফ নয়। অর্থাৎ জিয়া-শাফায়াতের গোপন সমঝোতায়ই ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়াকে তার বাসায় শাফায়াতের ট্রুপসের তত্ত্বাবধানে 'নিরাপদে' আটকে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা দখলের ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন মতলবে ভয়ঙ্কর গোপন খেলায় মত্ত ছিলো, যা উদ্‌ঘাটন করা বেশ জটিল ব্যাপার। এসব ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণার ব্যাপার। পরবর্তীতে ঐ অভ্যুত্থানের বিদ্রোহীদের, বিশেষ করে শাফায়াত জামিল ও হাফিজ উদ্দিনের প্রতি সদয় ব্যবহার এই ধারণা বদ্ধমূল করে।

১৬. শাফায়াতের ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের শক্তিকে খালেদ Over Estimate করেছিলেন। পদাতিক ব্রিগেডই সর্বেসর্বা। অন্যান্য সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো সব ফালতু, এমনিতরো ধারণার বশবর্তী তিনি তাদের শক্তি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। অথচ পরবর্তীতে দেখা গেলো, এসব সার্ভিস ইউনিটগুলোর সম্মিলিত শক্তি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৭. সর্বোপরি এসব অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে ভাগ্য (Luck) বিরাট ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী খালেদের সপক্ষে ছিলো না, যার জন্য মুক্তিযুদ্ধের একজন জনপ্রিয় সমরনায়ক হয়েও শেষ বেলায় তার ভাগ্যে নেমে এলো ব্যর্থতার গ্লানি। সৈনিকদের হাতেই করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সেনানায়ককে।" (পৃষ্ঠা : ১১১-১১৪)

সিপাহী-জনতা ভাই ভাই

৬ তারিখ দিবাগত শেষ রাতে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আবার সেনাপ্রধান হিসেবে বহাল করে সাধারণ সৈনিকরা চরম আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলো। তারা সবাই সশস্ত্র। তারা কোন অফিসারের হুকুমের অধীনে ছিলো না। মুক্ত বিহঙ্গের মতো তারা তখন স্বাধীন। হাজার হাজার সৈনিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকাল ৫টার আগেই সেনানিবাস থেকে বের হয়ে শহরে ঢুকে পড়লো। তাদের এ মিছিলে ট্যাঙ্ক বাহিনীও শরীক হয়ে গেলো। মিছিলে মিলিটারি জীপও ছিলো। জীপে আর কয়জনের জায়গা হয়? পদব্রজেই সবাই স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্থর গতিতে জীপ ও ট্যাঙ্ক মিছিলের শোভা বর্ধন করছে। তাদের স্লোগান ছিলো ঃ

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, জিয়া-মুশতাক জিন্দাবাদ। শেষ রাত ৪টায় রেডিওতে জেনারেল জিয়ার কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে জানা গেলো যে, তিনি দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অসময়ে এ খবর যে-ই শুনেছে সে-ই পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সবাইকে জানাতে লাগলো। গত কয়দিন রাজধানীতে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিলো। ঐটুকু খবর থেকে মানুষ আশ্বস্ত হলো যে, সেনাপতি জিয়া ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছে।

www.pathagar.com

মহল্লায় মহল্লায় খুব ভোরেই মানুষ রাস্তায় বের হয়ে অবস্থা জানার জন্য জমা হতে লাগলো। আর্মির জীপ শহরে ছড়িয়ে পড়লো। জনগণ আর্মির গাড়ি দেখে দলে দলে ঘিরে ধরলো। নতুন স্লোগান যোগ হয়ে গেলো, "সিপাহী-জনতা ভাই ভাই।" খোলা জীপে সৈনিকরা বিজয় উল্লাসে নৃত্য করতে থাকলো। জনগণও তাদের সাথে হাততালি দিয়ে নেচে নেচে, লাফিয়ে লাফিয়ে স্লোগানে শরীক হলো। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।!সিপাহী-জনতা একসাথে আনন্দে মেতে উঠেছে। কিসের আনন্দ? সবারই মনের ভাব হলো, "ভারতের দালালদের হাত থেকে দেশটা বেঁচে গেলো। বাকশালী দানবের খপ্পর থেকে বাঁচলাম। মুসলিম জাতি হিসেবে টিকে থাকার সুযোগ পাওয়া গেলো। কী-আনন্দ!"

সশস্ত্র সৈনিকরা আর্মির ট্রাক বা খোলা জীপে চড়ে স্বাধীনভাবে শহরে ঢুকে উল্লসিত জনগণের সাথে মিশে গেলো। একটি আর্মির গাড়ির বিবরণ এমন একজন থেকে সরাসরি শুনলাম, যিনি ঐ গাড়িতে চড়ে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত পুরানো ঢাকা শহরে কমপক্ষে ২৫টি জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি তখন জগন্নাথ কলেজে অনার্সের ছাত্র এবং অতি উৎসাহী ইসলামী কর্মী। বর্তমানে (২০০৪ সাল) তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি ইতিহাস গবেষক এবং বেশ কয়টি ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। তার নাম মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

আমি ৭ নভেম্বরের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার সাক্ষাৎ দাবি করার সাথে সাথে ঐ দিনই সন্ধ্যায় তিনি চলে এলেন। নাশতার পর কথা শুনবো বলে মনে করলাম। কিন্তু তিনি নাশতা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারলেন না। তার বক্তব্য শুরু হয়ে গেলো। তার বর্ণনাভঙ্গি ও উচ্ছ্বাস দেখে মনে হলো, যেন তিনি '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের পরিবেশে ফিরে গিয়েই এর বিবরণ দিচ্ছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলছেন

"৬ নভেম্বর দিবাগত শেষ রাতে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। বাংলাবাজার নিজেদের বাড়িতেই ছিলাম। রেডিওতে জিয়ার কণ্ঠ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বের হয়ে দেখলাম রাস্তায় আরও লোক। এগুতে এগুতে বাহাদুর শাহ পার্কে এসে দেখি আর্মির একটা ট্রাকে সশস্ত্র সৈনিকরা স্লোগান দিচ্ছে—নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী-বিপ্লব জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, মাইক হাতে একজন সৈনিক জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দ প্রকাশ করে সিপাহীদের বিজয় ঘোষণা করছে। কথাগুলোতে উচ্ছ্বাস থাকলেও আকর্ষণীয় ভাষায় বলতে পারছিলো না। ওরা তো আর বক্তা নয়! চারপাশে মানুষের ভিড় বেড়েই চলছে। মাইক আছে, বিরাট জমায়েত উপস্থিত। এ সময়ের উপযোগী বিপ্লবী ভাষা আমার মুখ থেকে উপচে পড়তে চায়। আর থাকতে পারলাম না। লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠেই সৈনিকের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। উপস্থিত জনতা আমার প্রতিটি কথাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করতে লাগলো। স্লোগানে শরীক হয়ে বিশাল জনতা নেচে উঠলো। এতো লোক সমবেত হলো যে, মাইকের আওয়াজ হয়তো পৌঁছতে পারছে না, কিন্তু স্লোগানে সবাই শরীক।

www.pathagar.com

পনেরো-বিশ মিনিট প্রাণ ভরে বক্তৃতা করে ট্রাক থেকে নেমে আসার উপক্রম করতেই সৈনিকরা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আপনাকে যেতে দেবো না, আমাদের সাথেই শহরে জনতার সামনে বক্তৃতা করতে হবে। ট্রাক পুরানো শহর ঘুরে দুপুর পর্যন্ত গুলিস্তান এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫টি সমাবেশে বক্তৃতা করে জুমুআর নামাযের জন্য বাইতুল মুকাররমে চলে গেলাম। জুমুআর নামাযে এতো লোক ছিলো যে, নামাযের পর বিশাল মিছিলের আকার ধারণ করলো। মিছিলে নিজামী ভাই ও কামারুজ্জামান ভাইকে দেখলাম।

লক্ষ লোকের আনন্দ মিছিল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঐ মিছিলে ছিলেন জেনে তার সাথে যোগাযোগ করলাম। ইসলামী ছাত্রসংঘের তখনকার সভাপতি নাসেরের সাথেও কথা বললাম। তাদের কাছ থেকে যা জানলাম তা-ই লিখছি, আবু নাসের (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা) থেকে জানা গেলো যে, এ বিশাল মিছিলের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু মাইকের ব্যবস্থা করা হয় এবং মিছিল কোন্ কোন্ পথে পরিচালনা করা হবে তাও ঠিক করা হয়। আরও জানা গেলো যে, বাইতুল মুকাররাম মসজিদ থেকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাঈন সাঈদী ও মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মা'সূম (মরহুম) মিছিলে শরীক ছিলেন।

মাওলানা নিজামী থেকে জানলাম যে, সেদিন সারা শহরেই মিছিল আর মিছিল। সারাদিনের পরও প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত রাজপথে মানুষ আর মানুষ দেখা যায়। রাজধানী যেন মহাউৎসব পালন করছে। এ মিছিলে কোন বক্তৃতা হয়নি। জুমুআর আগে সারা শহরেই আর্মির গাড়ি বা ট্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে অনেকে বক্তৃতা রাখে। পথে যাকেই বক্তৃতা করতে দেখেছে, সৈনিকরা তাদেরকে গাড়িতে ও ট্যাঙ্কে তুলে নিয়ে মাইক ধরিয়ে দিয়েছে বক্তৃতা করার জন্য। এসব বক্তা হয় ছাত্রসংঘের কর্মী, আর না হয় জামায়াতে ইসলামীর যুব-কর্মী। এ পরিস্থিতিতে যারাই বক্তৃতার যোগ্য তারাই সুযোগ পেয়েছে। সৈনিকরাই সুযোগ করে দিয়েছে।

নিজামী সাহেব থেকে আরও একটি স্লোগানের কথা জানলাম, "রুশ-ভারত সাবধান, আমরা সব মুসলমান।"

১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যেমন শুক্রবার দিন ছিলো, ৭ নভেম্বরও তেমনি জুমুআবার ছিলো। আগস্ট-বিপ্লবের ফলেই জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হন। ৭ নভেম্বরের সিপাহী-বিপ্লবেই তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে পুনর্বহাল হন। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আগস্ট-বিপ্লবকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালান। ৭ নভেম্বর আগস্ট-বিপ্লবকে পুনর্বহাল করে।

১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর জনগণের মধ্যে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৫ আগস্ট কারফিউ থাকায় জনগণ ৭ নভেম্বরের মতো রাজধানীতে স্লোগান দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে পারেনি। শুধু জুমুআর নামাযে যাবার সুযোগে নীরবে চোখে-মুখে ও ভাবভঙ্গিতে আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আগস্ট-বিপ্লব যে অপশক্তিকে উৎখাত করেছে, ৭ নভেম্বর ঐ একই শক্তিকে প্রতিহত করেছে।

www.pathagar.com

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টও শুক্রবার ছিলো। শুধু তাই নয়। রমযানের ২৬ তারিখ ছিলো। দিবাগত রাতটি ছিলো লাইলাতুল কদর। তারাবীহ নামাযের পর সারা রাত আযাদী উৎসবে মেতে ছিলাম। আমি তখন এমএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহরে মিছিলেই রাত কাটলো। স্লোগান ছিলো, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, দীন ইসলাম জিন্দাবাদ।

'৪৭-এর ১৪ আগস্ট, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর এ দেশের ইতিহাসের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এসব কয়টি দিনই ঘটনাক্রমে জুমুআবার হওয়া বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এ দেশের জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং তার কুরআনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এ মানবগোষ্ঠী কখনো আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না, এমন কোন ইশারা এর মধ্যে লুকিয়ে থাকতেও পারে।

তাহের ও জিয়ার ক্ষমতার লড়াই

আমার ধারণা ছিলো যে, খালেদ মোশাররফের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান সিপাহী-বিপ্লবের মাধ্যমে সেনাপ্রধান হিসেবে পুনর্বহালের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার লড়াই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে ৭ তারিখ রাজধানীতে সিপাহী-জনতার অভূতপূর্ব সংহতির ফলে রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিপক্ষ বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ৭ নভেম্বর সকাল ১০ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশে জিয়াউর রহমানকে হাজির করার প্রচেষ্টায় কর্নেল তাহের ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জিয়ার সমর্থক একদল সৈনিক ঐ সমাবেশকে বিতাড়িত করে দেয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জনগণের ময়দানে জিয়ার বিরোধী কোন শক্তি কোথাও সক্রিয় নেই।

কিন্তু ৭ নভেম্বর থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে ক্ষমতার ভয়ানক লড়াই চলার কথা কর্নেল হামিদের বই পড়ার আগে কিছুই জানতাম না। সেনানিবাসের বাইরে রাজনীতি সচেতন লোকেরাও কিছুই টের পায়নি। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তো সেনানিবাসের ভেতরে ছিলোই। বাইরের বিপ্লবী গণবাহিনীও সশস্ত্র অবস্থায় ভেতরেই সক্রিয় ছিলো। এ দু'বাহিনীকে ব্যবহার করে কর্নেল তাহের তার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে গেলেন। ৭ নভেম্বর সকাল থেকে শেষ রাত পর্যন্ত সেনানিবাসের সক্রিয় চিত্র কর্নেল হামিদের পুস্তক থেকে পরিবেশন করছি ঃ

টু-ফিল্ড ব্যারাক

৭ নভেম্বর। সকাল থেকে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিস-ব্যারাকে সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই সেই টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট, যারা ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে কর্নেল রশীদের নেতৃত্বে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এখন থেকে বঙ্গভবন নয়, টু-ফিল্ড ব্যারাকই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুরো দেশের ভাগ্য। জিয়াউর রহমানের অপারেশনের হেড-কোয়ার্টার তখন টু-ফিল্ড ব্যারাক। সবাই ছুটছে টু-ফিল্ড অভিমুখে। এক রাতেই জিয়াউর রহমানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। যেন যুগ যুগ ধরে এ বিপ্লবটিই অপেক্ষা করছিলো তার জন্য।

এলেন জেনারেল ওসমানী, এলেন জেনারেল খলিল, এয়ার মার্শাল তোয়াব, অ্যাডমিরাল এম.এইচ. খানসহ অন্যান্য সকল সিনিয়র অফিসারগণ। সবাই অভিনন্দন জানালেন

www.pathagar.com

জিয়াকে। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টা। দেখলাম একপাল সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে সিভিল ড্রেসে কে যেন এগিয়ে আসছে। ক্রাচে ভর দিয়ে লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের। এতো লোকজন নিয়ে সরাসরি সে একেবারে জিয়ার কামরায়ই ঢুকে গেলো। আমি ভেবেছিলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের অন্যান্যদের মতো এমনিই হয়তো জিয়াকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আমার ভুল ভাঙ্গলো অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ পর। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ওখানেই কনফারেন্স হলো। উপস্থিত ছিলেন জিয়া, ওসমানী, খলিলুর রহমান, তোয়াব, এম.এইচ. খান, মাহবুব আলম চাষী ও কর্নেল তাহের। বিপ্লবী বাহিনীর তাহের শুধু উপস্থিতই ছিলো না, সে তার জোরালো বক্তব্যও রাখলো। বাহিনী প্রধানদের কেউ প্রশ্নও রাখলেন না, কিভাবে পলিসি নির্ধারণ মিটিং-এ একজন বিপ্লবী বাহিনী নেতা উপস্থিত থাকলো!

প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মুশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের এর বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিএমএলএ হিসেবে জিয়া থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতা থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করেন। সুতরাং সায়েমই সিএমএলএ থাকলেন, জিয়াকে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডিসিএমএলএ-র পোস্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপূত ছিলো না, কারণ ভোরেই তিনি CMLA হিসেবে রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

৭ নভেম্বর জিয়ার জন্য খুবই ব্যস্ত দিন। ১২টার দিকে জিয়া ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা দেখার জন্য জীপ নিয়ে বের হলেন। সর্বত্র ঘুরলেন। সিগন্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, লাইট এ্যাক্ এ্যাক্ সব দিকে চক্কর লাগালেন। কোথাও থামলেন, কোথাও হাত নাড়লেন। সর্বত্র 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ'। দু-এক জায়গায় সৈনিকরা বিভিন্ন দাবিও পেশ করলো। তারা কিছু অফিসারের ফাঁসি দাবি করলো। জিয়া বললেন, তোমরা অস্ত্র দাও। শান্ত হও। আমি দাবিগুলো দেখছি।

সন্ধ্যায় জিয়া রেডিও স্টেশনে যান। সেখানে নতুন রাষ্ট্রপতি ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছিলো। সেখানে কর্নেল তাহেরও উপস্থিত ছিলো। তারা উভয়ে একত্রে বসে ভাষণ শোনেন। ভাষণ শেষে উত্তেজিত সৈনিকরা লিখিতভাবে তাদের ১২-দফা দাবির একখানি কাগজ পেশ করে। প্রায় জোর করে কাগজের উপর তারা জিয়ার সই নেয়। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় জিয়াকে। অবশ্য জিয়া আগেই অবস্থা অনুধাবন করে সারাক্ষণই তার অনুগত সৈনিকদের দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রাখেন।" (পৃষ্ঠা : ১৩৮-১৪০)

কর্নেল হামিদের দেখা সিপাহী-জনতার উল্লাস

সেনানিবাসের ভেতরে ক্ষমতার লড়াই চললেও ঢাকা শহরে জনগণের অবস্থা কর্নেল হামিদের বর্ণনায় দেখুন ঃ

ঢাকা শহরে জনতার উল্লাস (৭ নভেম্বর)

"আমি জীপ নিয়ে একবার শহরের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। শহরে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। হাইকোর্টের সামনে আর যেতে

www.pathagar.com

পারলাম না। হাজার হাজার মানুষ জীপ দেখে 'আল্লাহু আকবার' বলে নৃত্য করতে করতে ছুটে আসলো। আমি বিপদ বুঝে ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি জীপ ঘুরাতে বললাম। কিছুটা শান্ত দেখে কাকরাইলের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম, সেদিকেও একই অবস্থা। মিলিটারি গাড়ি দেখলেই আনন্দের আতিশয্যে জনতা তা ঘিরে ধরছে আর জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। রেসকোর্সের কাছে কয়েকটি ট্যাঙ্কের উপর বহু সিভিলিয়ান চড়াও হয়ে ফুর্তি করতে দেখলাম। আমি আর গুলিস্তানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেলাম না। কাকরাইল থেকেই ঘুরে পুনরায় শাহবাগ হয়ে দ্রুতগতিতে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, জনতার বেশিরভাগ ছিলো ইসলামপন্থি। তারা ক্রমাগত নারায়ে তাকবীর, আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিচ্ছিলো। জাসদের সমর্থক কোন মিছিল দেখলাম না। মনে হলো, সাধারণ মানুষ জাসদের জড়িত থাকার কথা কিছুই জানে না। সবাই ছুটছে এক অপূর্ব আবেগে, মুক্তির আনন্দে। অভূতপূর্ব দৃশ্য!

শহরের রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে দেখলাম, সৈনিকরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে ট্রাক বের করে এনে রাস্তায় সিভিলিয়ানদের সাথে মিশে মিছিল করছে আর স্লোগান দিচ্ছে, আল্লাহু আকবার। সিপাহী-জনতা ভাই ভাই।' জেনারেল জিয়া-জিন্দাবাদ।

সিপাহী-জনতার বিজয় মিছিল। চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সিপাহী-জনতার এমন মিলন দৃশ্য ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখিনি। সিপাহী-বিদ্রোহের সাথে জনতার একাত্মতা ঘোষণা, এক ঐতিহাসিক ঘটনা বটে। রাস্তায় কোথাও কোন অফিসারকে দেখলাম না। দিনটি ছিলো যথার্থই সিপাহীদের দিন। তাদের জন্য এক বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত!" (পৃষ্ঠা : ১৪১)

৭ তারিখ বিকেল থেকেই সেনানিবাসে শঙ্কা

৭ তারিখ দিবাগত রাত পর্যন্ত রাজধানীর সর্বত্র আনন্দ-উল্লাস চলে। সবাই নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, খালেদ মোশাররফের বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদে পুনর্বহাল হলেন। আগস্ট-বিপ্লব নস্যাৎ হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। জনগণের মধ্যে এ আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সারা শহরে।

অথচ জনগণের অগোচরে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক-বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলে। "অফিসারদের রক্ত চাই" স্লোগানকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে চালু করে একই রাতে অনেক অফিসারকে হত্যা করা হয়। ৭ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে কেমন মারাত্মক সংকটের মোকাবিলা করতে হয় তা জানার পর কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে আমার মনে চরম ঘৃণা জন্মে। বন্দুকের নলে বিপ্লবের দর্শনে বিশ্বাসীদের নিকট তাহের হিরো হতে পারেন, কিন্তু ইসলাম ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের নিকট অবশ্যই ঘৃণ্য। কর্নেল তাহেরের ষড়যন্ত্র সফল হলে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যেতো। তাহের সফল না হলেও সেনাবাহিনীতে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো, জিয়াউর রহমান কীভাবে এর মোকাবেলা করলেন তা দেশবাসীর জানা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐ সংকট যে কত ভয়ঙ্কর ছিলো তা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এতো বছর পরও আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

www.pathagar.com

তাহের বিজয়ী হলে জিয়াউর রহমানকে অবশ্যই নিহত হতে হতো। তাঁকে নিহত করা ছাড়া তাহেরের বিজয় কিছুতেই চূড়ান্ত হতো না। তাহের বিজয়ী হলে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে রুশ-ভারতের কর্তৃত্বে চলে যেতো। ফলে বাকশালের চেয়ে অধিক মারাত্মক ব্যবস্থা চালু হতো। ৭ থেকে ১৩ নভেম্বরে ঢাকা সেনানিবাসে বাংলাদেশের ভাগ্যের ফায়সালা কীভাবে হলো এবং কীভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজের জীবন বিপন্ন করে সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেন তা রীতিমতো চমকপ্রদ ঘটনাবলির সমষ্টি।

সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল আবদুল হামিদ ঐ মহাসংকটে সেনাপতি জিয়ার সহায়ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তার পূর্বোল্লিখিত 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান' নামক গ্রন্থে গোটা ঘটনার যে চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছেন তা আমার ভাষায় লিখলে পাঠক-পাঠিকাগণ ঐ রোমাঞ্চ ও শিহরণ থেকে বঞ্চিত হবেন, যা আমি বই পড়ে অনুভব করেছি। তাই দীর্ঘ হলেও তারই ভাষায় পরিবেশন করছি। এ দীর্ঘ বিবরণকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও কিছু অংশ বাদ দিয়েছি।

৭ থেকে ১৩ নভেম্বর

৭ তারিখ বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে আবার টু-ফিল্ডে গেলাম জিয়ার কাছে। বারান্দায় উঠতেই দেখি একটি কক্ষে বসে আছে কর্নেল তাহের। মুখ তার কালো, গম্ভীর, ভারী। তিন-চারজন অফিসার– কর্নেল মাহতাব, কর্নেল আবদুল্লাহ, কর্নেল আমিন তার সাথে বসে। আমাকে সালাম দিলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার তাহের? তুমি এতো গম্ভীর কেন? বললো, স্যার আপনারা কথা দিয়ে কথা রাখবেন না। মন খারাপ হবে না? আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কর্নেল আমিন মুচকি হেসে আমাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গেলো। বললো, বুঝলেন না স্যার! ব্যাপারটা তো সব তাহেরের লোকজনই ঘটিয়েছে, এখন জিয়াকে মুঠোয় নিয়ে বারগেন্ করছে। এখন তো সে জিয়াকে মেরে ফেলতে চায়।

এতক্ষণে বুঝলাম 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়'। সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে অন্য কোন বিপ্লবী বাহিনীর উপস্থিতির কথা আমার মাথায়ই আসছিলো না। এখন বুঝতে পারলাম আশেপাশে এলোমেলো গোছের উর্দিপরা লোকজন নিয়মিত সৈনিক নয়, বিপ্লবী বাহিনীর লোক। কর্নেল আমিনুল হককে বললাম, তোমার ফোর বেঙ্গল তোমার কন্ট্রোলে আছে তো?

'অবশ্যই'

"তাহলে তুমি তোমার লোকজন নিয়ে এখনই ডিফেন্স পেরিমিটার তৈরি করে সাবধান থাকো। আমার কাছে তো অবস্থা গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

"জানি না স্যার আজ রাতে কি হবে। তাহের উল্টোসিধা কথা বলছে। তবে আমার লোকজন ঠিক আছে।" আমিন বললো।

"এখানে টু-ফিল্ডের খবর কি?"

"টু-ফিল্ড তো সুবেদার মেজর কমান্ড করছে। কোন অফিসার নেই। বিপ্লবীতে ভরে গেছে। দেখছেন না আশেপাশে।"

"জিয়া ভেতরে আছে?"

"স্যার আছেন। আপনি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলুন না। রাত্রে গণ্ডগোল হতে পারে।"

www.pathagar.com

"হ্যাঁ যাচ্ছি?"

আমি ভেতরে তার কক্ষে গিয়ে দেখি জিয়া বসে বসে সৈনিকদের দেওয়া দাবি-দাওয়ার কাগজ পড়ছে। বসতে বললো। তার মেজাজ মোটেই ভালো না। নিজেই বলতে লাগলো, ব্যাটারা কি পাইছে! যেখানে যাই সেখানে দাবি। বললাম, দাবি কয়টা? বিগড়ে গিয়ে বললো, একশোটা। ব্যাটাদের আমি ভালো করে দাবি মিটিয়ে দেবো। আমি বললাম, মনে হচ্ছে আজ রাতে কিছু গণ্ডগোল হতে পারে। তোমার টু-ফিল্ডে থাকা উচিত হবে না। বিপদ কিছুটা সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো। আমার কথা শুনে তার মুখ আরো শুকনো হয়ে গেলো। শুধু বললো, Keep Watch. আমিনকেও বলো চোখকান খোলা রাখতে। আরও বললো, তুমি যাও না। টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিসকে তো চেনো। ওর সাথেও একটু আলাপ করো।

আমার কাছে অবস্থা বড়ই ঘোলাটে মনে হলো।

টু-ফিল্ডের আশেপাশে বিভিন্ন রকমের সৈনিকরা এখানে-ওখানে জটলা করছিলো। তারা কে কোন্ পক্ষের বোঝা মুশকিল হয়ে পড়লো। কর্নেল তাহেরের কথা এবং মুড থেকে আমি স্পষ্ট বুঝলাম, তাহের এবং জিয়ার মধ্যে বড় রকমের মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাহেরের ভাষায়, জিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দু'জনই এখন উন্মুক্ত ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখী। রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। বারান্দায় কর্নেল আমিনকে পায়চারী করতে দেখলাম। তার কপালে চিন্তার রেখা। দেখেই বললো; কি স্যার, চীফের সাথে কি কথা হলো? কিছু বললেন নাতো। অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সে তোমাকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছে। খুব সাবধান থাকো।

অবস্থা আমার কাছে মোটেই সুবিধার মনে হলো না।

আশেপাশে সৈনিকরা অস্ত্র কাঁধে ঘোরাফেরা করছে। জটলা করে কি যেন ফিশ্‌ফিশ্ আলোচনা করছে। তাদের হাবভাব অন্য রকম। কিছুক্ষণ পর আমি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলাম। রাস্তায় দেখি বেশ কিছু অফিসার গাড়ি করে, রিক্‌শা করে, ফ্যামিলি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমনিতে রাস্তাঘাটে কোন লোকজন নেই। ছম্‌ছম্ অবস্থা। পথে আমার অফিসের সামনে একজনকে দেখলাম। তিনি কর্নেল (পরবর্তীতে মন্ত্রী ও জেনারেল) মাহমুদুল হাসান। তার চোখেমুখে শঙ্কা। ছুটে এসে বললো, স্যার, প্লিজ বলুন কি হচ্ছে? অফিসাররা পালাচ্ছে কেন? আমি তাকে বললাম, ব্রাদার তুমি এক্ষুণি বাসায় ছুটে যাও। পারলে ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়ে যাও। অবস্থা ভালো না। কি হচ্ছে, আমিও জানি না। সে উদভ্রান্তের মতো তখনই বাসার দিকে ছুটে চললো।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে এক অজানা আতঙ্ক সারা ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়লো। রাস্তাঘাট সন্ধ্যার আগেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্টে কমান্ড কন্ট্রোল আর 'ডিসিপ্লিন' বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। বিপ্লবীদের প্রোপাগাণ্ডা, হাজার হাজার বিপ্লবী লিফলেটস্ ইত্যাদির প্রভাবে ইতোমধ্যে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসে গেছে লক্ষ্য করলাম। তারা অফিসারদের প্রতি অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিলো। ৪র্থ বেঙ্গল এবং টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কিছু বিশ্বস্ত অফিসার জেসিও এবং সৈনিক জেনারেল জিয়াকে আগলে রেখেছিলো। বাদবাকিদের মতিগতি যেন কেমন হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টে সকালবেলা যে পরিবেশ বিদ্যমান ছিলো, বিকেলে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অফিসাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা ধীরে ধীরে সরে পড়তে লাগলো। মনে হলো, যে কোন মুহূর্তে তাহেরের জিয়া-উৎখাত প্ল্যান শুরু হয়ে যেতে পারে। দুপুরে সৈনিকরা তিনজন অফিসারের উপর গুলি চালালো।

নিচে কারা যেন কড়া নাড়লো। সমুজ আলী ছুটে গেলো। ভিতরে এসে ঢুকলো সুবেদার আলী ও হাবিলদার সিদ্দিক।

"সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। এক্ষুণি তৈরি হয়ে যান। ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে চলে যান। আর দেরি নয় স্যার, চলুন বাইরে। আপনার জীপ নিয়ে এসেছি।"

"কেন কি হয়েছে?"

স্যার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। টু-ফিল্ড লাইনে বিপ্লবীদের মিটিং হয়েছে। জিয়া সাব দাবি-দাওয়া মানেন নাই। আজ রাত্রে সব অফিসারদের মেরে ফেলা হবে। সবাই পাগল হয়ে গেছে। সার চান্স নিয়েন না, এক্ষুণি চলুন।"

"না, না, আমি স্টেশন কমান্ডার। আমি স্টেশন ছেড়ে পালাতে পারি না। তোমরা চাইলে মারতে পারো।"

"দোহাই আল্লার, স্যার, আপনি চলে যান। সব অফিসার চলে যাচ্ছে।"

"না আমি যাবো না। ফ্যামিলিও যাবে না।"

আমার দৃঢ়তা দেখে তারা আর বেশি চাপাচাপি করলো না। তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বললো, সমুজ আলী তুমি থাকো, আমরা আবার আসছি। আমার জীপ নিয়ে তারা লাইনে চলে গেলো। ২০ মিনিট পর তারা চারজন সিপাহী নিয়ে এবং ৬টি অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল নিয়ে আমার বাসায় ফিরে আসলো। বললো, স্যার আমরা মিটিং করে আপনার সেফটির জন্য চারজন ভলন্টিয়ার সিপাহী নিয়ে আসলাম। তারা বাসার ভেতর থেকে আপনাকে গার্ড দেবে। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী বললো, আমার দুইটা রাইফেল আছে। কুছ পরওয়া নাই। দেখি কোন ব্যাটা আসে।

৭/৮ নভেম্বর ঃ রক্তাক্ত রাত

সন্ধ্যা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেলো বড় রাস্তায়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাইনে পৌঁছে মেজর নাসের ও মেজর গাফ্ফারকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। খালেদ মোশাররফের ক্যুর সাথে এ দু'জন অফিসার জড়িত ছিলেন। তারা ৪র্থ বেঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল আমিন, মেজর মুনীর ও সৈনিকরা অফিসারদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালো। কিছুক্ষণ জোর কথা কাটাকাটির পর ট্যাঙ্কাররা ফিরে গেলো। অফিসারদ্বয় বেঁচে গেলেন।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো। চারিদিকে অজানা আতঙ্কের ছায়া। ভয়াবহ ক্যান্টনমেন্ট। মাঝে মধ্যে গুলির শব্দ। রাত আনুমানিক ১২টা। গভীর অন্ধকার। আমার নিচতলায় থাকতেন সিগন্যাল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সামস। হঠাৎ গেটে তুমুল চিৎকার, হট্টগোল। গেট ঠেলে ভেঙে ১০/১২ জন সিপাহী ঢুকে পড়লো চত্বরে। তারা নিচতলায় কর্নেল সামসের বাসা আক্রমণ করে বসলো। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে

www.pathagar.com

তাকে দরজা খুলতে বলে চিৎকার দিতে লাগলো। কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। সিপাহীরা ক্রমাগত লাথি মেরে মেইন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়লো। ততোক্ষণে সামস্‌রা সবাই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছেন। ঘরে কাউকে না পেয়ে প্রবল আক্রোশে তারা খালি ঘরে গুলি চালাতে লাগলো। মুহূর্তে বাড়ির ভিতর এর ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হলো, আমরা আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। দুটো গুলি উপরের তলায় একেবারে আমার পায়ের নিচে এসে লাগলো। ভয়ে আমার বাচ্চারা কাঁদতে লাগলো।

নিচতলায় কর্নেল সামস্‌কে না পেয়ে বিপ্লবী সিপাহীরা এবার সিঁড়ি বেয়ে আমার বাসার দিকে ধাওয়া করলো। তারা উপর তলায় উঠে আসলো। বারান্দায় আমার ব্যাটম্যান সিপাহী সমুজ আলী ও অন্য চারজন সিপাহী প্রবলভাবে তাদের বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু তারা ছিলো সংখ্যায় বেশি। সমুজ আলীদের ঠেলে এবার তারা একবারে আমার বেডরুমের দরজায় পৌঁছে হাঁকা-হাঁকি করে দরজা খুলতে বললো। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী অসম সাহসে বিপ্লবীদের বলতে লাগলো; দেখুন ভাই সাহেবরা, আমাদের সাহেবকে কিছু করলে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে ছাড়বো না। আমি দেখলাম, দরজা না খুললে বিপ্লবীরা দরজা ভেঙেই ভেতরে ঢুকে পড়বে। অতএব, আমি দরজা খুলে বেরুতে গেলাম। আমার স্ত্রী আমাকে থামিয়ে বললো, দাঁড়াও আমিই যাবো, বলেই সে দরজা খুলে একেবারে আক্রমণকারীদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

লেডিজ দেখে বিপ্লবীরা প্রথমে থতমতো খেয়ে গেলো। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললো, আপনি সরুন। আমরা আপনাকে চাই না, অফিসারকে চাই। রক্তপাগল সৈনিকরা আমার স্ত্রীকে গুলি করতে পারে ভেবে আমি নিজেই তাড়াতাড়ি দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। বললাম, আমি কর্নেল হামিদ, তোমরা কি চাও? একজন বিপ্লবী গুলি করার জন্য রাইফেল তুলতেই সমুজ আলী ও অনুগত সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপটে ধরলো। সমুজ আলী বললো, খবরদার বলছি, ভালো হবে না। তারা বিপ্লবীকে প্রবলভাবে ঠেলে পেছনে নিয়ে গেলো। ঐ ব্যাটাই ছিলো লিডার। মনে হলো এরা ভিন গ্রহের বিপ্লবী সিপাহী। বাকিদের দু-তিন জনকে সামসের সিগন্যাল ইউনিটের মনে হলো। আমার সিপাহীদের দৃঢ়তা দেখে তারা পিছপা হলো। তারা রাগে গড় গড় করতে করতে ফিরে চললো। একজন বললো, দাবি না মানলে আমরা কোন অফিসারকে জিন্দা রাখবো না। যাহোক আমরা কোনক্রমে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলাম।

৭/৮ নভেম্বর ঐ বিভীষিকাময় রাত্রে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠলো। ঘটে গেলো বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। বহু বাসায় হামলা হলো। অনেকে বাসায় ছিলেন না। অনেকে পালিয়ে বাঁচলো। সৈনিকরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করলো, মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে। মেজর আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। অর্ডিন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন, যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গীপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকরা বনানীতে কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান,

www.pathagar.com

তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিলো দুইজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডিনান্স স্টেটে দশজন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথম জন এক তরুণ ই.এম.ই ক্যাপটেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। বাকিরা অনুনয় বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বেঁচে গেলো তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। টিভি ভবনে তিনজন অফিসার মারা পড়লেন। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই অ্যাকটিভ ছিলেন, তাদের ধরে গুলি করা হয়। তিনদিন পর তাদের লাশ পাওয়া যায় একটি ডোবায়। সেনাবাহিনী মেডিক্যাল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তার বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করলো। তিনি পিছন দিকে পালিয়ে যান, কিন্তু পরে আবার সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন। বিপ্লবীরা তার দুই হাত মুড়িয়ে যখন গুলি করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। হঠাৎ আশুরিক শক্তিতে বনবাদাড় ভেঙে তিনি দেন ছুট। তারা পিছনে গুলি ছুঁড়লেও আর তাকে ধরতে পারেনি। রাস্তার ওপারে অর্ডিন্যান্স স্টেটের অবস্থা ছিলো ভয়াবহ।

উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকরা দলবেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়। ভীতসন্ত্রস্ত অফিসাররা প্রাণ রক্ষার্থে বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোঁপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারারাত কাটায়। ১২ জন অফিসার মারা পড়েন ঐ রাতে। আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে যান বেশ ক'জন অফিসার। সারারাত চরম আতঙ্কের মধ্যদিয়ে কাটালো। ঐ রাতে বিপ্লবী সৈনিকরা সত্যি সত্যিই অফিসারদের রক্ত-নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিলো। ভাগ্যিস অধিকাংশ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সন্ধ্যার আগেই শহরে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। সিপাহীগণ কর্তৃক আপন অফিসারদের উপর হামলা এর আগে কস্মিনকালেও ঘটেনি! এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা!

৮ নভেম্বর

ভোর হতে না হতেই সারা ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের ছায়া। আপন সিপাহীদের কাছ থেকে অফিসাররা ছুটে পালাতে লাগলো। ঢাকা ইউনিটে, হেডকোয়ার্টারে, অফিসে কোথাও অফিসার নাই। সবাই ছুটে পালাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে। যে যেদিকে পারছে শহরে ছুটে যাচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে। এদিন সকাল ৮টার সময়ও কয়েকজন অফিসারের উপর গুলি বর্ষণ করা হলো। বহু অফিসারকে সৈনিকরা নাম ধরে খুঁজতে লাগলো।

নিরাপত্তার অভাবে অফিসাররা সেনানিবাস ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। আমি জিয়াকে বহু চেষ্টা করেও কোথাও পেলাম না। আমি তাদের বললাম, আগে প্রাণ বাঁচান। তারপর খবর নিন। কেউ কেউ শহরে আত্মীয়-স্বজন না থাকায় অখ্যাত হোটেলে উঠে আত্মগোপন করলেন।

মহান সিপাহী-বিপ্লব ৮ নভেম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অফিসার দেখলেই সিপাহীরা তাড়া করছে। সিপাহীরা বাধ্য করলো তাদের কাঁধের র‍্যাঙ্ক নামিয়ে ফেলতে। কেউ র‍্যাঙ্ক পরতে পারবে না। সেনাবাহিনীতে কোন অফিসার থাকবে না। আমি যথারীতি অফিসে গেলাম। আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে আমাকে নিতে। অফিসে

www.pathagar.com

আমার সুবেদার সাহেব বললেন, "স্যার আপনাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দয়া করে অফিসের বাইরে গেলে কাঁধে আপনার কর্নেলের র‍্যাঙ্কটা নামিয়ে যাবেন।" চতুর্দিকে মহাবিপদ। সব অফিসার তা-ই করছে। অফিসে আমি র‍্যাংক পরেই থাকলাম, কিন্তু জীপ নিয়ে বেরুবার সময় র‍্যাংক নামিয়ে বেরুলাম। আমি জিয়াকে খুঁজছিলাম। সে পাগলের মতো এখানে-ওখানে ঘুরছিলো। চতুর্দিকে গণ্ডগোল থামাতে ক্যান্টনমেন্টের সবখানে ছুটে গিয়ে সিপাহীদের এসব কাণ্ড বন্ধ করতে বললো। তারা বিভিন্ন দাবি পেশ করলো। জিয়া বললো, আগে তোমার অস্ত্র জমা দাও, আমি সব দাবি মানবো।

কর্নেল তাহেরের ইঙ্গিতে বিপ্লবী সৈন্যরা এখন একেবারে উল্টে গেছে। বিপ্লবীরা জিয়াকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। জিয়া সৈনিকদের ১২-দফা দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। সৈনিকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে ১২-দফা দাবির ভিত্তিতে কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করেছে, সেই দাবিগুলো মানতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিয়া এখন পিছিয়ে গেছে। এখন তারা জিয়াকে হত্যা করবে। সব অফিসারদের হত্যা করবে-বিপ্লবীদের আস্ফালন।

সৈনিকদের বিপ্লব এখন নতুন মোড় নিলো। অফিসারদের রক্ত চাই। রক্ত চাই।

বেলা ১০টার দিকে সৈনিকদের একটা বড় মিটিং হলো ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গ্রাউন্ডে। সুবেদার কাযী জানালো, জিয়া সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আসবেন। তবে আমাকে ওদিকে যেতে মানা করলো। সে একদল সৈনিক নিয়ে ওদিকে চলে গেলো। সৈনিকদের ঐ উন্মুক্ত সভায় বেশ ক'জন বিপ্লবী সৈনিক বিপ্লবী ভাষণ দেয়। বহু দাবির কথা বলা হয়। ঐ মিটিং-এ প্রায় সবাই ছিলো সশস্ত্র। আনাড়িদের হাতেও ছিলো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। সভাতেই একজনের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে আপনা-আপনি গুলি বেরিয়ে গেলো। দু'জন সৈনিক ঘটনাস্থলেই নিহত হলো এবং কয়েকজন আহত হলো। জিয়া বললেন: আপনারাই দেখুন, ডিসিপ্লিন না থাকলে কি অবস্থা হয়। জিয়া স্পষ্ট ভাষায় সৈনিকদের বললো, আপনারা হাতিয়ার জমা দিন। শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরে আসুন। ব্যারাকে ফিরে যান। অযথা রক্তপাত করবেন না। আপনারা ক্যান্টনমেন্টের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।

আসলে ঐ সময় সৈনিকরা খুবই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলো। অফিসারদের তারা ক্যান্টনমেন্টে যেখানেই পেয়েছে, তার র‍্যাঙ্ক খুলে ফেলেছে, ধরে অপমান করেছে। মিটিং-এ একজন বিপ্লবী সৈনিক সম্বোধন করলো, জনাব জিয়াউর রহমান....। সঙ্গে সঙ্গে জিয়া তাকে সংশোধন করলেন, আমি জনাব জিয়া নই, আমি জেনারেল জিয়া। সৈনিক নেতা থতমত খেয়ে গেলো। অতঃপর সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো।

সৈনিক সমাবেশে জিয়ার আকুল আহ্বান তারা আমল দিলো না। হিংসাত্মক পরিবেশের কোন উন্নতি হলো না। বরং জাসদ তাদের ১২-দফা দাবি না মানা পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেওয়ার জন্য সৈনিকদের নির্দেশ দিলো। বহু লিফলেট বিতরণ করা হলো।

৮ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সৈনিকদের সামনেই অফিসাররা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালাতে লাগলো। সৈনিকরা কৌতুক ভরে দেখতে লাগলো। অবশ্য বহু

www.pathagar.com

ইউনিটের বিশ্বস্ত সৈনিক নিজেরাই ছাউনির বাইরে তাদের পার করে দিয়ে আসে।" (পৃষ্ঠা : ১৪৩-১৪৮)

৮ নভেম্বর

সকাল থেকে জিয়া চতুর্দিকে ঘুরছে। সৈনিকদের সাথে সরাসরি কথা বলছে। তবু তারা সেনাপ্রধানের কথায় কান দিচ্ছে না। কমান্ড-কন্ট্রোল ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আমি এক সময় অনুমান বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জিয়াকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ধরতে পারলাম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, জিয়া। মলিন মুখে তার চেয়ারে বসে শূন্যে তাকিয়ে আছে। কাছে কেউ নেই। তাকে স্টেশনের এসব অবস্থা অবহিত করলাম। বললাম, অফিসাররা সবাই ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোন সিকিউরিটি নাই। জিয়া বললো, হামিদ আমি সব দেখেছি। সকাল থেকে ঘুরছি। আমার করবার কিছুই নেই। আমি ওদের বুঝাচ্ছি। কিন্তু কেউ বুঝতে চায় না। তারা পাগল হয়ে গেছে। বলো কি করি? তুমি তো পুরানো অফিসার, স্টেশন কমান্ডার। তুমিও একটু একটু বুঝাও না। তবে সেইফ থেকে ঘুরাফিরা করো। ফ্যামিলিকে পারলে বাইরে পাঠিয়ে দাও। তার সাথে কথা বলে বুঝলাম ঐ মুহূর্তে সেও অসহায়। তাকে এতো অসহায়, এতো বিধ্বস্ত অবস্থায় আমি আর কোন দিন দেখিনি। সৈনিকরা যেখানে অফিসারের নির্দেশ মানা দূরের কথা, তাদের রক্ত চাচ্ছে, সেখানে একা সে কিইবা করতে পারে?

৭ তারিখ সকালবেলা যে ছিলো বিজয়ী বীর, জনপ্রিয় সম্রাট। ৮ তারিখ সকালবেলা তাকে মনে হলো সমস্যা জর্জরিত ভগ্ন-হৃদয় মুকুটহীন এক সম্রাট! দু-চারটি কথার পর আমি চলে আসছিলাম। জিয়া বললো, অফিসারদের ডাকো। আমি তাদের সাথে আগামীকাল নয়টায় হেডকোয়ার্টারে কথা বলবো। রণক্লান্ত জিয়া। ভাবলাম রেস্ট করুক। আমি তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি DMO নুরুদ্দীনকে গিয়ে জিয়ার অভিপ্রায় জানালাম।

প্রায় সব অফিসারই ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে শহরে চলে গিয়েছিলেন। যারা স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন তাদের বললাম অন্য সবাইকে জানাতে যে, আগামীকাল আর্মি হেডকোয়ার্টারে আসতে। খবর পেলাম শহরেও বেশ কয়টি বাড়িতে সৈনিকরা হামলা করেছে অফিসারদের খুঁজতে গিয়ে। ঢাকা সেনানিবাস সিপাহী-বিদ্রোহের দিনগুলোতে একটি হিংস্র জঙ্গলের রূপ নেয়। জিয়া সিনিয়র জেসিও-দের মাধ্যমে ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সিপাহীরা যাতে অফিসারদের রক্তপাত না করে তার জন্য সর্বত্র আকুল আবেদন জানাতে লাগলেন।

একা সে কি করবে! জিয়ার আর্মি হেডকোয়ার্টারেও অফিসাররা নেই। প্রাণ ভয়ে সবাই পালিয়েছে। গুটি চার অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার পাশে। এর মধ্যে একমাত্র কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) নুরুদ্দীনকেই নিয়মিত টেবিলে কার্যরত দেখতে পেলাম। আর সবাই পালিয়েছে। রাত্রেও জিয়ার সাথে বিভিন্ন সৈনিক গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছিলো। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিলো। একই সাথে জাসদ পার্টির কিছু লোকজনও বাসায় গিয়ে তার সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করছিলো।

জিয়াই এককভাবে আলোচনা ও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়াই

www.pathagar.com

জানতেন, ওদের সাথে তার কি সমঝোতা হয়েছিলো। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, তাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জিয়ার মুক্তির জন্য নভেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জড়িত হয়, তাহেরের সাথে জিয়ার একটা গোপন ১২-দফা ভিত্তিক পূর্ব-সমঝোতার ভিত্তিতে। ১২-দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি শ্রেণীহীন বাহিনীতে পরিণত হতো। তাদের প্রস্তাবিত 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠিত হলে সেখানে জিয়ার ক্ষমতাও বহুলাংশে খর্বিত হয়ে পড়তো। মুক্তি পাওয়ার পর এসব বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেই জিয়া তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন।

৮ নভেম্বর সারাদিনই অফিসারেরা পালাতে লাগলো। এমনকি তরুণ ব্যাচেলার অফিসাররাও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে গেলো। ফ্যামিলিওয়ালাতো সবাই তাদের পরিবার সরিয়ে নিলো। খোদ জিয়ার শ্যালক লে. সাইদ ইস্কান্দারকেও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যেতে হলো। আগের রাত্রে বিপ্লবীরা ব্রিগেড অফিসার মেস আক্রমণ করলে সাইদসহ অন্যান্য তরুণ অফিসাররা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পেছন দিকে পালিয়ে যায়। আমার স্ত্রীও বললো শহরে তার বোনের বাসায় চলে যেতে, কিন্তু আবার বললাম, স্টেশন কমান্ডারকে যদি সিপাহীদের ভয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালাতে হয়, তাহলে আমার আর্মি ছেড়ে দেয়াই উচিত। অন্যদের কথা স্বতন্ত্র।

আমার সুবেদার কাযী ও বিশ্বস্ত হাবিলদার সিদ্দিকও বললো, সব অফিসার রাত্রে ফ্যামিলিসহ চলে গিয়েছেন, আপনি অন্তত ফ্যামিলি শহরে পাঠিয়ে দিন। আমি রাজি হলাম না। বললাম, মারলে তো তোমরাই মারবে। তারা লজ্জায় মুখ ঢেকে বললো, স্যার আমাদের লাশের উপর দিয়ে আপনাকে মারতে পারবে। হাবিলদার সিদ্দিক বললো, একটু আগে আপনার স্টাফ অফিসার মেজর আলাউদ্দিনকে ক্যান্টনমেন্ট পার করিয়ে দিয়ে এলাম বোরখা পরিয়ে।

"বোরখা পরিয়ে?"

"জ্বি স্যার, আমাদের জীপে আমার পাশে বসিয়ে মহিলাদের বোরখা পরিয়ে তাকে পার করলাম। কি করবো স্যার!"

সে বললো আরো অনেক বোরখাধারী অফিসারকে এভাবে রাস্তায় দেখা গেছে। তাদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ দেখি রিক্শা চড়ে দু'জন লেডিশ আসছেন। একজন শাড়ি পরা, অন্যজন বোরখাধারী। আমার কৌতূহল হলো। রিক্শা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? হিমশিম খেয়ে বোরখাধারী মোটা মহিলা বোরখা ফাঁক করে তার চেহারাখানা দেখালেন। বললেন, আসসালামু আলাইকুম স্যার। বোরখার ভেতর কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ! সিদ্দিকের কথাই ঠিক। শাড়িপরা মহিলা আসল, বোরখাধারী নকল। বোরখাধারী অফিসারকে আমি চিনে ফেললাম। সিপাহীদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার সব রকম উপায়ই তখন অফিসাররা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাকে বললাম, Cheer up এগিয়ে যাও। বাম দিকে গেলে ভালো হবে। একজন গোয়েন্দা সিনিয়র অফিসার মেয়েদের শাড়ি পরে বনানীর দিকে পালানোর সময় সিপাহীদের হাতে ধরা পড়েন। তার অবস্থা দেখে সিপাহীরা তো হেসে কুটিকুটি।

৮ নভেম্বর অবশ্য অফিসারদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকার মতো কোন পরিবেশ ছিলো না। বিপ্লবী সৈনিকদের প্ররোচনায় সাধারণ সৈনিকরাও ঐদিন ভিন্ন মূর্তি ধারণ

www.pathagar.com

করেছিলো। এসব অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলে কারো পক্ষে এখন বিশ্বাস করা কঠিন। বহু বছর পর আজ যখন ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ করি, তখন মনে হয়, এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমার ইউনিফরমের মর্যাদার জন্য ক্যান্টনমেন্টে ফ্যামিলি নিয়ে অবস্থান করে এতো রিস্ক নেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

৯ নভেম্বর

সকাল নয়টা। শহর থেকে এবং আশপাশ থেকে গোটা ত্রিশেক অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টার-এ সমবেত হয়েছিলেন। তারা প্রায় সবাই সিভিল ড্রেসে। যে কজন ইউনিফরম পরে ছিলেন তাদের র‍্যাংক পরেননি। র‍্যাংক দেখলেই সিপাহীরা ধরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত অবস্থা। সবারই চোখে মুখে ভীতির ছায়া। সিপাহীদের আক্রমণে অফিসারদের মৃত্যু সংবাদ, লুটপাট, বিচ্ছিন্ন আক্রমণ সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিলো। জিয়া এলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। নিচু স্বরে বললেন, আপনারা সরে পড়েছেন। ঠিক আছে। এই সময় ফ্যামিলি দূরে রাখাই ভালো, আমি চেষ্টা করছি ওদের বুঝাবার। ইনশাল্লাহ শীঘ্র সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। সিপাহীরা কিছু উত্তেজিত আছে। হঠাৎ সুর উঁচু করে বললেন, But you must face them.....

ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়ে তার প্রস্থান। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসারগণ তার কথায় কোন আশার বাণী খুঁজে পেলো না। তাড়াতাড়ি যার যার পথে নিরবে প্রস্থান করলো। যাওয়ার পথে জিয়া আমাকে বললেন; হামিদ, আগামীকাল দশটার দিকে আমার কাছে এসো।

৯ তারিখ জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও এবং এনসিওদের সাথে বেশ কিছু মিটিং করলেন। তাদের অনুরোধ করলেন, সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে আসার এবং অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে বলতে। তাদের দাবি-দাওয়া আস্তে আস্তে মানা হবে। তার কথায় জেসিও-রা শান্ত হলেও সিপাহীরা অশান্ত থেকেই গেলো। জিয়া তাদের দাবি-দাওয়া না মানাতে তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ঠায় বসে রইলো। বিভিন্ন দিকে তারা মিটিং করতে থাকলো। জিয়া সুকৌশলে জেসিও এবং এনসিও-দের তার কাছে ভেড়াতে সচেষ্ট হলেন। ঐ সময় একমাত্র জিয়া ছাড়া আর সব কমান্ড-চ্যানেল ভেঙ্গে যায়। আর্মি চিফ-অব-স্টাফ জেনারেল জিয়া সরাসরি জেসিও, এমন কি সিপাহী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করছিলেন। টু-ফিল্ডের সুবেদার আনিসুল হক চৌধুরী, আরো ২/৩ জন জেসিও এই সময় জিয়ার পাশে থেকে সৈনিকদের বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারাদিন কোন বড় রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য পুরো দিন ক্যান্টনমেন্টে কোন অফিসারও ছিলেন না। অফিস কাজকর্ম ছিলো সম্পূর্ণ বন্ধ। সর্বত্র বিরাট অচলাবস্থা। অরাজকতা। অফিস, ব্যারাক সবকিছু সিপাহীদের দখলে। বিপ্লবীরা সর্বত্র ঘুরে ফিরে সৈনিকদের উত্তেজিত করছিলো, দাবি-দাওয়ার প্রচুর লিফলেট সর্বত্র বিতরণ করছিলো।

অবাক ব্যাপার। ঢাকার শহর ছিলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ অনেকেই ক্যান্টনমেন্টের এই অস্বাভাবিক ঘটনার কথা কিছুই টেরও পায়নি। ঐদিন বিকেলে জাসদের একটি বিজয় মিছিল ও মিটিং অনুষ্ঠিত হলো বায়তুল মোকাররমে। জিয়ার নির্দেশে গুলি চালিয়ে তা ভেঙ্গে দেওয়া হলো। বিভ্রান্ত জনগণ। একবার শোনে সিপাহী-বিপ্লব, জাসদের বিপ্লব। আবার দেখে জাসদের মিটিং-এ গুলি। আসল ব্যাপার কি?

www.pathagar.com

১০ নভেম্বর

জিয়া ৯/১০ তারিখ রাত থেকে যশোহর থেকে আনা কর্নেল সালামের (পরে জেনারেল) কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের লোকজন দ্বারা সেনা হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করে নিজে সেখানে অবস্থান নেন। এভাবে প্রকারান্তরে ব্রিগেডিয়ার শওকত সুকৌশলে তার ব্রিগেডের লোকজন দ্বারা জিয়ার চতুষ্পার্শ্বে বেড়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। জিয়াও এবার নিজেকে বিপ্লবী টু-ফিল্ড, ল্যানসার ও জাসদপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সেনাসদরে পৌঁছে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে লাগলেন। যদিও তার অজান্তেই মাকড়শার দল তার চারপাশে দ্রুত নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিলো।

গতরাতে কোন সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কোন গোলাগুলির আওয়াজও শোনা যায়নি। অনেক অফিসার শহর থেকে টেলিফোনে নিজেদের ইউনিটের জেসিওদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।

সকাল ১০টায় জিয়া আমাকে ডাকলেন। আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার কাছে গেলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, হামিদ, স্টেশনের খবর কি? আমি বললাম, আজ তো মোটামুটি ভালোই দেখছি। সে বললো, তোমাকে ডাকলাম, আমি তোমাকে লগ এরিয়া কমান্ডার বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেডিয়ার রউফকে রিপ্লেস করো। লগ এরিয়াতে তোমার বহু কাজ রয়েছে। বুঝতেই পারছো, প্রথম কাজই হচ্ছে এখন কমান্ড কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনা। সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা।

বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কন্ট্রোলেই আছে। সমস্ত সমস্যা দাঁড়িয়েছে তোমার লগ এরিয়া ইউনিটগুলো নিয়ে। সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো একেবারে ওয়াইল্ড হয়ে গেছে। এ ছাড়া তোমার কমান্ডে রয়েছে বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিট। ট্যাংক নিয়ে এরা যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছে। এদের সবাইকে যেভাবেই হোক তোমার কন্ট্রোলে আনতে হবে। ঢাকার ইউনিটগুলোর কাছে তুমি তো ভালোভাবেই পরিচিত। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে তোমাকে সবাই চেনে। অতএব, তাড়াতাড়ি টেকওভার করে কাজ শুরু করে দাও। এখন অর্ডার-সর্ডারের অপেক্ষা করো না। কোন অফিস ফাংশন করছে না। তুমি কালকের মধ্যেই টেকওভার করো। এখন যাও।

আমি চলে যাচ্ছিলাম। আবার ডেকে বললো, দেখো, তুমি তো জানো, বহু 'ব্লাডি বিপ্লবী আর্মডম্যান' ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে গেছে। ওদেরকে শক্ত হাতে ট্যাকল্ করতে হবে। ৪৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনের সাথে যোগাযোগ রাখবে। সে-ই এখন এ্যাকটিং কমান্ডার।

আমি লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে কোন অফিসার ছিলো না। সুবেদার মেজরকে ডেকে বললাম, আগামীকাল আমি আসবো। তারা অবশ্য আমাকে ভালো করেই চিনতো। আমি আসছি শুনে তারা খুবই খুশি হলো। ঐদিন বিকেলের দিকে আবার আর্মি হেডকোয়ার্টারে গেলাম। অপারেশন রুমে নুরুদ্দীনের কাছে কয়েকজন অফিসারকে সিভিল ড্রেসে বসে থাকতে দেখলাম। এমন সময় কে একজন এসে বললো, স্যার চিফ আপনাকে ডাকছেন। আমি সোজা ভেতরে গেলে জিয়া বললো, 'হামিদ তুমি যাও তো, 38 LAA রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দেবে না বলে জানিয়েছে।

www.pathagar.com

তারা রাস্তাঘাটে ফায়ার শুরু করেছে। দেখতো কিছু করতে পারো কিনা।' আমি তাকে হেসে বললাম, 'ওরা তো আমার কমান্ডে নয়। ওরা কি আমার কথা শুনবে?' বললো, 'তবু যাও, একটু দেখো। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে তোমাকে তারা চিনবে।'

আমি কি আর করি। বললাম, আচ্ছা যাই। আমি DMO কর্নেল নুরুদ্দীনের কামরায় ফিরে এসে দেখি সেখানে আর্টিলারির কর্নেল আনোয়ার (পরে জেনারেল) এবং কর্নেল সুফী (পরে জেনারেল) বসে আছে। আমি আনোয়ারকে বললাম, এই যে, আনোয়ার, তুমি তো আর্টিলারির কমান্ডার। চলো একটু এ্যাক্ এ্যাক্ রেজিমেন্ট ঘুরে আসি। ওখানে গণ্ডগোল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, স্যার, আমি জানি, কিন্তু যাবো না। Why should I kill myself for nothing. কর্নেল সুফী তার পাশে বসেছিলো। বললাম, 'চলো সুফী, তুমি আসো।' সে ইনফেন্ট্রির অফিসার, তবু সে রাজি হলো। এমন সময় টু-ফিল্ড আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিস এসে হাজির। আমি তাকে বললাম, 'চলুন আনিস সাহেব, ৩৮ এ্যাক এ্যাক রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দিচ্ছে না। গোলমাল করছে। চলুন একটু ঘুরে আসি।' তিনি রাজি হলেন। সুফীকে ধন্যবাদ দিয়ে আনিসকে আমার জীপে বসিয়ে ওদিকে চললাম।

এয়ারপোর্ট বড় রাস্তার উপর পৌঁছে দেখি সেখানে ক্রমাগত ফায়ারিং হচ্ছে। রাস্তায় যান বাহন চলাচল বন্ধ। আমরা দু'জন রেল ক্রসিং এর কাছে গাড়ি থেকে নেমে টুপি খুলে বারবার ইশারা করতে লাগলাম গোলাগুলি থামাতে। প্রায় পাঁচ মিনিট চেষ্টার পর তারা ফায়ারিং বন্ধ করলো। আমি তখন জীপ চালিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ফায়ার করলো। সুবেদার মেজর আনিস বললো, আর এগুনো ঠিক হবে না স্যার, আপনি একটু বসুন। প্রথমে আমি তাদের সাথে কথা বলি। তারপর আপনি আসুন। খুবই সাহসী জেসিও বটে।

সে বেপরোয়াভাবে সামনে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললো, শোনো! আমি টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিস। ফায়ার থামাও। বলেই তিনি সোজা তাদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। ওখানে আরো কয়েকজন জেসিও এগিয়ে এলো। সিপাহী অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে সুবেদার মেজর আনিস ছিলো একজন বড় মাপের সৈনিক-নেতা। দেখলাম তার সাথে সবাই শ্রদ্ধাভরে কথা বললো। ৩/৪ মিনিট কথা হলো। সে ফিরে আসলো, বললো, স্যার ফিরে চলুন। আপনার যাওয়া লাগবে না। আজ সন্ধ্যার আগেই তারা সব হাতিয়ার জমা দিতে রাজি হয়ে গেছে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জীপ ঘুরিয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে জিয়াকে বললাম, ফায়ারিং বন্ধ হয়েছে। তারা সন্ধ্যার আগেই অস্ত্র জমা দেবে। জিয়া বললো, থ্যাংক ইউ। বললাম, সুবেদার মেজর আনিসকে সাথে নিয়েই গিয়েছিলাম। বললো, He is very useful JCO. তাকে এখানে থাকতে বলো। আমিও কথা বলবো।

কমান্ডার লগ এরিয়া

আমি ১১ তারিখ লগ কমান্ডারের অফিসে গিয়ে কমান্ড নিলাম। অর্থাৎ খালি চেয়ারে গিয়েই বসলাম। ব্রিগেডিয়ার রউফকে তখন গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিলো। হেড কোয়ার্টারে তখন কোন অফিসার নাই। সুবেদার মেজর, ক্লার্ক, সিপাহীরা ছিলো। আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার মতোও কেউ ছিলো না। সবকিছুই গোলমেলে। আমি

www.pathagar.com

সুবেদার মেজরকে বললাম, আগামীকাল থেকে আমি নিয়মিত অফিসে বসবো। সব ইউনিটে যেন তা অফিস-অর্ডারের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

৪৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনুল হককে ফোন করলাম। আমিন খুব খুশি হলো। বললো 'স্যার, আমার ব্রিগেডের ট্রুপস্ সব কন্ট্রোলে আছে। এখন আপনি লগ এরিয়ার ইউনিটগুলো কন্ট্রোলে আনেন। দরকার হলে আমিও সাপোর্ট দেবো। জেনারেল জিয়া এখন খুবই অসুবিধায় আছেন। চিফ আমাকেও বলেছেন, আপনার সাথে যোগাযোগ রেখে ক্যান্টনমেন্ট ইউনিটগুলোতে কমান্ড-কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনতে।

প্রকৃতপক্ষে কর্নেল আমিনুল হকই গত ২/৩ দিন ধরে ৪র্থ বেঙ্গলের কিছু বিশ্বস্ত ট্রুপ নিয়ে জিয়াকে আগলে রেখেছিলো। এর মধ্যে যশোহর থেকে কর্নেল (বর্তমানে জেনারেল) সালামের কিছু কমান্ডো ট্রুপ নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও জিয়া তার কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক তার পাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছেন। জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও, এনসিও, এমনকি সিপাহীদের প্রতিনিধিদের সাথে অফিসে, বাসায়, ঘনঘন সরাসরি আলোচনা চালিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন।

আমি লগ এরিয়া কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করে পরদিন থেকে একা একাই স্টাফ-কার নিয়ে ঢাকার ইউনিটগুলোতে চক্কর দিতে থাকি। সিগন্যাল্স্, সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, বেইজ ওয়ার্কশপ, সিওডি, এমপি সবগুলো ইউনিটেই অরাজক অবস্থা। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ইউনিটগুলোর সৈনিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের বুঝাতে থাকি। এসব ইউনিটগুলোর সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিলো শিক্ষিত। তারা ১২ পয়েন্ট দাবির যৌক্তিকতার কথা সর্বত্র আমাকে তুলে ধরলো। ব্যাটম্যান প্রথা, তাদের বেতন ভাতা, তাদের ধীরগতি প্রমোশন, তাদের বাসস্থান, তাদের পজিশন ইত্যাদি সবগুলো পয়েন্টই ছিলো যথার্থ। আমি বললাম, আমিও তোমাদের অধিকাংশ দাবি সমর্থন করি। আমি নিজে চিফকে অনুরোধ করবো এগুলো মেনে নিতে। তারা বললো, স্যার জেনারেল জিয়াকে আমরা মুক্ত করেছি, খালেদকে মেরেছি, কিন্তু তিনি এখন আমাদের দাবিগুলো মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি ব্যারাকে গিয়ে তাদের বুঝাতে লাগলাম, জিয়া এসব দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসলেই এক এক করে ব্যবস্থা নিবেন। তাকে একটু সময় দিতে হবে। তারা আশ্বাস দিলো আর কোন গণ্ডগোল হবে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিলো বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টে। ফাইটিং ইউনিট, শক্তিশালী ট্যাংক। ১৩ তারিখ উন্মুক্ত মাঠে পুরো ইউনিটের ছয়-সাতশো সৈনিকদের একত্র করে তাদের সামনে ভাষণ দিলাম। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মোমেনও উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে আকুল অনুরোধ জানালাম, অস্ত্র নামিয়ে শৃঙ্খলায় ফিরে আসতে। তারা বেশ ক'টি প্রশ্ন রাখলো, বললো, জিয়াউর রহমান কথা রাখে নাই। প্রকাশ্যে মিটিং-এ দু'তিন জন বিভিন্ন প্রশ্ন তুললো। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ার কড়া দাবি রাখলো। আমি সবাইকে আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করলাম। তারা শান্ত থাকবে বলে আমাকে হাত তুলে কথা দিলো। কথা দিলো এখন আর কোন গণ্ডগোল করবে না।

আমি সেখান থেকে সরাসরি আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার কাছে গেলাম এবং তাকে

www.pathagar.com

ল্যান্সার সৈনিকদের সাথে আমার মিটিং-এর কথা অবগত করলাম। জেনারেল শওকত বসেছিলেন। তিনি ঐ মুহূর্তে বাহ্যত সিজিএস-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। শওকত বললেন, এদের তোষামোদ করে কোন লাভ নেই। জিয়াও তাকে সমর্থন করলেন, বললেন, হ্যাঁ, আর তোষামোদ নয়, আমি তাদের ইনফেন্ট্রি ডিভিশন দিয়ে ঠাণ্ডা করবো। Just wait and see. আমি বুঝালাম, 'এসব দরকার হবে না। তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে।' কিন্তু তিনি আমার সাথে দ্বি-মত পোষণ করলেন। শওকতের কথাই ঠিক, তিনি বললেন।

এ কয়দিন আমি প্রতিটি বিদ্রোহী ইউনিটে ছুটে বেড়ালাম। সবখানেই সৈনিকরা আমাকে অকপটে শান্ত থাকবে বলে কথা দিলো। অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আমি লগ এরিয়ার সকল অফিসারদের ইউনিটে ফিরে আসার জন্য শক্ত নির্দেশ পাঠালাম। প্রায় সবগুলো ইউনিটেই অফিসাররা ফিরে আসলেন। অনেকে ফ্যামিলি নিয়েও ক্যান্টনমেন্টে ফিরলেন। অনেক ইউনিটে জেসিও এবং সৈনিকরা নিজেরা গাড়ি করে অফিসারদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনলো।

আমার অধীনস্থ লগ এরিয়ার ১৩টি ছোট বড় ইউনিটগুলোর সৈনিকরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী। ১২ তারিখ থেকে বেশিরভাগ অফিসার ক্যান্টনমেন্টে নিজ নিজ ইউনিটগুলোতে ফিরে আসতে শুরু করেন। ১৪/১৫ তারিখের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

এবার সিপাহী-অফিসার ভাই ভাই

সৈনিকগণ তাদের অফিসারদের আবার যথাযথ সম্মান দেখানো শুরু করলো। তাদের পূর্ব ব্যবহারের জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। প্রায় প্রতিটি ইউনিটে এখন সৈনিকগণের সাথে অফিসারদের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান করে পুনর্মিলন পালন করা হলো। রক্তাক্ত যুদ্ধের পর এসেছে শান্তি। এবার 'সিপাহী অফিসার ভাই ভাই।' করমর্দন, গলাগলি, কোলাকুলি, হাসি-মশকরা সর্বত্র আনন্দমুখর দৃশ্য। এসব দৃশ্য এখন মনে হলে রীতিমতো হাসির উদ্রেক হয়।

এই সময় জেনারেল জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় সবগুলো বিদ্রোহী লগ এরিয়া ইউনিট পরিদর্শনে গেলাম। অবশ্য আমার ইউনিটগুলোতে নিয়ে যাওয়ার আগে জিয়া বারবার আমাকে বলে দেয়, কোন সিপাহী তার কাছে ১২-দফার দাবির কথা তুলতে পারবে না। তাদের দাবি শুনতে শুনতে সে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। অতএব, আমি আগে থেকেই সিনিয়র জেসিও-দের সেইভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখি। COD-র বিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গিয়েছিলো। এসব লুণ্ঠিত অস্ত্র দিয়েই গত ক'দিন ধরে বিপ্লবীরা সারা ক্যান্টনমেন্টে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জিয়া আমাকে নিয়ে সিওডি ভিজিটে গিয়ে এসব বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তাদের অফিসারদেরকে সিপাহীদের সামনেই দারুণ বকাবকি শুরু করলো। তাদের কমান্ডার কর্নেল বারী অনুপস্থিত ছিলেন, ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে জেনারেল) মান্নান সিদ্দিকীকে সামনে পেয়ে খুব একচোট নিলো। বললো, এখানে তোমরা সব মেরুদণ্ডহীন অফিসার। একজন অফিসার সিপাহীদের সামনে দাঁড়ালে এমনটি ঘটতো না।

www.pathagar.com

জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শনে যাওয়ায় নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতি ঘটলো। অফিসারদের মধ্যেও প্রবল সাহসের সঞ্চার হলো। সবাই বুঝতে পারলো সেনাপ্রধান এখন আর অসহায় নন, তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। এর ফলে ইউনিট কমান্ডাররাও দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলো। অতঃপর এসব পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতলবে এবার জোঁট বেধে সেনাপ্রধানের কাছে ভেড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো, তারাও যারা ক'দিন আগেও জিয়ার নাম শুনলে নাক সিঁটকাতো। (পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫৭)

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল তাহের

মেজর ডালিম ও কর্নেল হামিদের লেখা গ্রন্থে এ দু'জনের যে পরিচয় পেলাম তাতে যোগ্য সেনা অফিসার হিসেবে দু'জনের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাবোধ করছি। মুক্তিযুদ্ধে দু'জনের বিরাট অবদান দু'গ্রন্থেই প্রশংসিত।

কিন্তু ব্রিগেডিয়ার খালেদের ক্ষমতার অদম্য লোভ নিজেকে তো ধ্বংস করলোই, সেনাবাহিনীতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো। তিনি সেনাপ্রধান জিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে কর্নেল তাহের সিপাহী-বিপ্লবের কোন সুযোগই পেতেন না। যোগ্য লোকদের সঠিক পদক্ষেপে যেমন বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়, তেমনি তাদের ভ্রান্ত তৎপরতা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

খালেদ মোশাররফের একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় সেনা বিদ্রোহীদের হাতে কত যোগ্য অফিসার নিহত হয়ে গেলো। কর্নেল হামিদের মতে, জিয়াউর রহমানের গোটা শাসনামলে বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবার পরিণামে সেনাবাহিনীতে ১৮টি বিদ্রোহ হয়েছে এবং তাতে শত শত সৈনিক ও বহু অফিসারের ফাঁসি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জিয়াকেও সেনাবাহিনীর হাতেই নিহত হতে হয়। জিয়া হত্যাকারীরাও নিহত হয় এবং এ হত্যার বিচারে বহু যোগ্য অফিসারের ফাঁসি হয়। এভাবে খালেদের জের চলে।

বিস্ময়ের বিষয় যে, সেনাপ্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সংহত হবার পরও সেনা-বিদ্রোহের জন্য প্রধান দায়ি কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে অফিসার হত্যা অভিযানের অভিযোগে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পূর্বোল্লিখিত জাসদ নেতার মতে, কর্নেল তাহের ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হবার পরও জিয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনা জারি রাখেন। '৭৫-এর ২৮ নভেম্বর আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার উদ্দেশ্যে ২৩ নভেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এক হাউজ-টিউটরের বাসায় বৈঠকরত অবস্থায় কর্নেল তাহের গ্রেফতার হন এবং সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। '৭৬-এর ২১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার ফাঁসি হয়।

সমাপ্ত

www.pathagar.com